উৎসর্গ

স্নাতকোত্তর পঠদ্দশায় যাঁর কাছে মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলাম, আমার সেই পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

মহাশয়ের চরণপ্রান্তে

গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ

মধ্যযুগের কাব্য-সমালোচনার ঐতিহ্য দ্বিশতাব্দী-প্রাচীন। এই আলোচনার প্রথম স্থত্রপাত দেখি ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের ইংরেজিতে রচিত বাংলা ব্যাকরণে। তারপর উনিশ শতকের শেষার্ধে যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু হলো তখন থেকেই মধ্যযুগের কাব্যালোচনার একটি ধারাবদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠল। সেই ঐতিহ্য অদ্যাবধি অব্যাহত। এই ঐতিহ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই আলোচনা প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় কাব্যসাহিত্যের তিনটি প্রসঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ ১ বিষয়ভাব, ২. ঐতিহাসিক পটভূমি, ৩. ভাষা-ছন্দ-অলংকার। মধ্যযুগের কাব্যপাঠে এই তিনটি প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ; কিন্তু এই তিনটি প্রসঙ্গ ছাড়াও এই যুগের কাব্যপাঠেব আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ আছে, যেগুলি আমাদের দেশের কাব্যসমালোচকদের কাছে সচরাচর তেমন গুরুত্ব লাভ করে না। আমি এই গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের এই উপেক্ষিত দিক নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আপাতদৃষ্টিতে এই গ্রন্থকে তিনটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন রচনার সংকলন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী পাঠক-মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে উপেক্ষিতের প্রতি গুরুত্বদানই এই গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ ঐক্যসূত্র। এই ঐক্যস্থত্রের বন্ধনে এর তিনটি রচনা স্বতন্ত্র হয়েও পরস্পর-সংলগ্ন।

মধ্যযুগের কাব্যালোচনা যথার্থভাবে করতে হলে আগে সমালোচককে কাব্যটির যথার্থ পাঠ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে, কারণ কাব্যের আলোচ্যমান পাঠ নির্ভরযোগ্য না হলে তাঁর বিচারও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। এইজন্য মধ্যযুগের কাব্যসমালোচককে পুথিপাঠ ও পাঠসমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় কাব্যের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, কিন্তু পুথিপাঠ ও পাঠসমালোচনার তেমন কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেই, ফলে এই বিষয়ে সামান্য পরিমাণে বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাদি লেখা হলেও কোন প্রণালীবদ্ধ বইপত্র লেখা হয় নি। এ ব্যাপারে 'বাংলাদেশে'র গবেষকেরা কিছুটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। সম্প্রতি ডঃ আবদুল কাইউম

রচিত 'পাণ্ডুলিপি-পাঠ ও পাঠসমালোচনা' নামে একটি বই আমার হাতে এসেছিল। পুথিপাঠ ও পাঠসমালোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে বইটিতে মূল্যবান আলোচনা আছে। এই বইটি এবং সমবিষয়ক আরো কয়েকটি ইংরেজি রচনা পড়ে বাংলা পুথিপাঠ ও পাঠসমালোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা করার প্রেরণা অনুভব করি। বর্তমান গ্রন্থের 'পুথিপাঠের ভূমিকা' প্রবন্ধটিকে তারই প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। কিছুদিন হলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুথিশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচীতে পুথিপাঠ ও পাঠসমালোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই প্রবন্ধটি একেবারে নিষ্ফল হবে না আশা করি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'মধ্যযুগের কাব্যসংগীত : রূপ ও রীতিকে'ও একটি পরিকল্পনাধীন বড় রচনার প্রাথমিক খসড়া বলে ধরে নিলে গ্রন্থকারের প্রতি সুবিচার করা হবে। মধ্যযুগের কাব্যরূপের আলোচনা করতে গিয়ে এ যাবৎ তার ভাষা, ছন্দ ও অলংকার নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বহিরঙ্গমূলক। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য একান্তভাবে সংগীতাশ্রয়ী, তাই এর কাব্যরূপের বিচার করতে হলে ঐ যুগের সাংগীতিক পটভূমিকাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতবিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণ ভট্টাচার্য এবং আমার প্রাক্তন সহকর্মী ও সংগীততত্ত্ববিদ্ ডঃ সুবোধরঞ্জন রায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে এবং স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ সংগীততত্ত্ববিদের গ্রন্থাদি পড়ে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করার প্রেরণা বোধ করি। বিষয়টি এখনো আমার ব্যাপকতর গবেষণা ও নিবিড়তর নিরীক্ষণের অপেক্ষায় আছে। এখানে আমার প্রাথমিক খসড়াটি নিবেদন করলাম। উদ্দেশ্য, গুণিজনেরা আমার ভুলত্রুটি শুধরে দিয়ে আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন।

গ্রন্থের তৃতীয় 'প্রবন্ধ'টি আমার রচনা নয়, এটির রচয়িতা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তী। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ইছাই পালার একটি বেশ প্রাচীন পুথি আছে। এ পর্যন্ত রূপরামের রচনার কোন পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশিত হয় নি, কিন্তু এ বিষয়ে নানা জায়গায় গবেষণার কাজ চলছে। তবে ভাল পুথি না পেলে এই গবেষণা সুসম্পন্ন হতে পারে না। তাই আমাদের পুথিটি এই সুযোগে প্রকাশ করলাম।

বলাবাহুল্য, আমার উদ্দেশ্য পুথিটির সম্পাদনা নয়, যথাযথ মুদ্রণ। তাই মূল পুথির পাঠের কোনরকম পরিমার্জন বা পরিবর্তন করি নি। তবে প্রয়োজন-বোধে আমার কিছু সহায়ক মন্তব্য পাদটীকায় যোগ করেছি। আশা করি গবেষকরা এর দ্বারা উপকৃতই হবেন।

বইটির রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে আমি নানা জনের কাছে নানাভাবে ঋণী। প্রথম কৃতজ্ঞতা আমার বিভাগীয় সহকর্মীদের কাছে। বিভাগীয় অধ্যক্ষ ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এবং অন্যান্য সহকর্মী ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত, ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ, ডঃ অরুণ বসু, ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায় ও ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সমবেতভাবে আমাকে বিভাগীয় পুথিশালার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার অর্পণ করে আমার মধ্যযুগীয় কাব্যপাঠের সুযোগ প্রশস্ততর করে দিয়েছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ঋণ পূজ্যপাদ ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও। ডঃ সেন তাঁর অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে মধ্যযুগের বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে আমার অনেক প্রশ্নের নিরসন করেছেন এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বাংলা পুথি-পরীক্ষার উদার অনুমতি দিয়েছেন। এঁরা আমার শিক্ষাগুরু, এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য, এঁদের আমি প্রণাম জানাই। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক ও সহাধ্যায়ী বন্ধু ডঃ তুষার মহাপাত্র এবং বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুকুমার মিত্র ও শ্রীঅরুণ বসুর সাগ্রহ সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে সহাধ্যায়ী শিল্পী-বন্ধু শ্রীঅজয় গুপ্ত, ওর তিরস্কারের ভয়ে ওকে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানালাম না। এ ছাড়া, যেসব সহাধ্যায়ী ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি, যেমন—ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় [সচিব, কলাবাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়], শ্যামল সেনগুপ্ত, কল্যাণাশিস দাশগুপ্ত, ডঃ বরুণ চক্রবর্তী প্রভৃতি আমার এই রচনা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান ঔৎসুক্য প্রকাশ করে আমাকে শেষ পর্যন্ত বইটি প্রকাশ করতে বাধ্য করেছেন, তাঁদেরও এ প্রসঙ্গে প্রীতিসমেত স্মরণ করি।

বাংলা পুথিশালা
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৫০

নির্মল দাশ

সূচীপত্র

পুথিপাঠের ভূমিকা

এক বর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিঁয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বান্ধেন পণ্ডিত ॥
বণিক্‌খণ্ড : চণ্ডীমঙ্গল।

১. পুথির উপকরণ

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত নানা লিপি-সম্বলিত সীলমোহর, ধাতুফলক ও মৃৎফলক থেকে মোটামুটি দুটি জিনিস বোঝা যায় : (১) আর্যরা আসার বেশ আগেই ভারতে লিখনপদ্ধতির সূচনা হয়েছিল, (২) লেখার ব্যাপারে তখন যেসব উপকরণ ব্যবহৃত হত তাদের মধ্যে স্থায়ী উপকরণ ছিল ধাতুফলক ও মৃৎফলক। সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হবার পর যখন আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটল তখন এইসব পুরনো উপকরণের সঙ্গে আরও কতকগুলি নতুন উপকরণ ব্যবহৃত হতে লাগল। এই সব উপকরণের মধ্যে আছে : গাছের পাতা ও ছাল, পশুর চামড়া, কাপড়ের পট, ইট, পাথর ও কাঠের ফলক। এর সঙ্গে সব শেষে যুক্ত হয়েছিল তুলট কাগজ। প্রাচীনকালের এই সব উপকরণের মধ্যে অবশ্য গাছের পাতা ও ছালের ব্যবহারই বহু-ব্যাপক ছিল। ৪র্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দের গ্রীক আগন্তুকেরা এদেশে লেখার কাজে কাপড় ও ভূর্জগাছের ছাল ব্যবহৃত হতে দেখেছেন। খোটান ও আফগানিস্তানে যেসব বৌদ্ধ শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই ভূর্জপত্রে লেখা। পরবর্তীকালে কালিদাস (৫ম শতক) ও ক্ষেমেন্দ্র (১১শ শতক)-ও লেখার কাজে ভূর্জ গাছের ছাল ও পাতা ব্যবহারের আভাস দিয়েছেন। ভূর্জ গাছ ছাড়া অন্য যে গাছের পাতা সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো তাল গাছ। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় লিপিকর্মের ইতিহাসে তালপাতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ, লেখার কাজে তালপাতা শুধু নিজে ব্যবহৃত হয়েই ক্ষান্ত হয় নি, লেখার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণের আকারকেও অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পরবর্তীকালে যখন ধাতুপাত ও

কাগজ দিয়ে লেখার প্রয়োজন হয়েছে তখন সেই উপকরণকেও অনেকক্ষেত্রে কেটে ছেঁটে তালপাতার আকারে দাঁড় করানো হয়েছে। মধ্য এশিয়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পাঞ্জাবে এমন অনেক তাম্রলিপি পাওয়া গিয়েছে যার আকারই শুধু তালপাতার মত নয়, তার মাঝখান দিয়ে তালপাতার মত বন্ধনছিদ্রও আছে। আর কাগজের পুথির অবয়বে তালপাতার আকার-সাদৃশ্য তো স্বতঃস্পষ্ট।

লেখার কাজে ঠিক কবে থেকে তালপাতার ব্যবহার শুরু হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে দীর্ঘদিন ধরে উত্তর ও দক্ষিণভারতের লিপিকরেরা লেখার কাজে তালপাতা ব্যবহার করে তালপাতা-লিখনের এক একটা আঞ্চলিক প্রথা তৈরি করে ফেলেছিলেন। এইসব প্রথার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, দক্ষিণভারতের লিপিকরেরা সরু ফলকযুক্ত ছুরি দিয়ে তালপাতায় আঁচড় কেটে হরফ লিখতেন, তারপর তাতে কাঠ-কয়লার গুঁড়ো বা পাতার রস ঘসে আঁচড়গুলোকে কালো করতেন; অন্যদিকে উত্তরভারতের লিপিকরেরা কালো কালিতে লিখে তাতে এক ধরনের সাদা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে কালো কালির উজ্জ্বলতা বাড়াতেন। পুথির জন্য কাগজের প্রচলন শুরু হবার পর উত্তর ভারতে তালপাতার একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু দক্ষিণভারতে তালপাতার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে।

লেখার জন্য এদেশে কাগজী পুথির ব্যবহার সম্ভবতঃ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের আগে শুরু হয় নি। কথিত আছে, ১১শ শতাব্দীতে সুলতান মাহ্‌মুদ গজনী পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে কাগজের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। প্রথম প্রবর্তনের পর তার বহু-ব্যাপক প্রচলনের জন্য আরও ১০০।১৫০ বছর সময় অতিবাহিত হওয়া ইতিহাসের দিক থেকে অসংগত নয়। সম্ভবতঃ তুলো জাতীয় আঁশ থেকেই এই কাগজ তৈরীর সূত্রপাত, তাই হাতে তৈরী কাগজের নাম তুলট কাগজ। তবে তুলো ছাড়াও পাট, কাপড়ের টুকরো, শন, ঘাস, খড়, তুঁত গাছের ছাল থেকে মণ্ড বানিয়ে তা দিয়েও কাগজ তৈরী করা হত। কাগজকে টেকসই ও পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কাগজে হরিতাল, তেঁতুলের বীচি বা লাউয়ের কাথ মাখানো হত। এর ফলে পুথির কাগজের রঙ হত হলদে ধরনের। অনেক সময় লেখার পর শাঁখ বা ঝিনুক দিয়ে ঘসে কাগজের উজ্জ্বলতা বাড়ানো হত। কাগজে চালের মাড় লাগিয়েও অনেক সময় কাগজ মসৃণ করা হত। তবে

মাড়ের কাগজের অসুবিধা ছিল এই যে এই কাগজে সহজে পোকা ও আর্দ্রতা (damp) লেগে যাবার আশংকা থেকে যেত। পুথি সাধারণতঃ লেখা হত কালো কালিতে, তবে কখনো কখনো পুথির শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্ত পুথিতে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে লাল কালি ব্যবহার করা হত। কালি তৈরীর জন্য কখনো শিমুল, গাব, হরিতকী, আমলকী, বাবলা, ডালিম, অর্জুন প্রভৃতি গাছের ছাল ও ফলের রস ব্যবহার করা হত, কখনো আবার চাল পুড়িয়ে কালো ভূষাকালি তৈরী করা হত। লেখার জন্ত ব্যবহার করা হত বাঁশের কঞ্চি, খাগ, হাঁস-শকুন বা ময়ূরের পালক ও ধাতব লেখনী।

পুথি কাগজেরই হোক বা গাছের পাতারই হোক তা ভালো করে রক্ষা না করলে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া, আধুনিক খাতার ধরনে সেলাই করার পদ্ধতিও অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের আগে প্রবর্তিত হয় নি। তাই পুথির মাঝখানে একটা ছিদ্র রাখা হত, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বন্ধনসূত্র চালিয়ে পুথি বেঁধে রাখা হত। কখনো কখনো বন্ধনসূত্রের জন্ত জায়গা ছাড়লেও সুতো পরানো হত না। ফলে পুথির পাতা এলোমেলো হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এ ছাড়া, ধুলো-বালি লেগে পুথি নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কাও ছিল। এই সব কারণে পুথির সুরক্ষার জন্ত পুথির ওপরে ও নীচে শাল বা সেগুন কাঠের দুখানি পাটা দিয়ে পুথি বেঁধে রাখা হত। কখনো আবার চামড়ার খোলেও পুথি রাখা হত। সাধারণতঃ পাতার পুথির জন্যই চামড়ার খোল বেশি ব্যবহৃত হত। কাঠের পাটায় অনেক সময় নানারকম চিত্র আঁকা থাকত। বলা বাহুল্য এই সব চিত্র ছিল পুথির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

পুথিরচনা ও অনুলেখনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল দেশের পণ্ডিত-সমাজ ও নানা ধর্মপ্রতিষ্ঠান। সেকালে একটি প্রবচন ছিল 'গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ' অর্থাৎ যার যত পুথি সে তত পণ্ডিত। কাজেই পণ্ডিতেরা নিজেদের পাণ্ডিত্যচর্চার প্রয়োজনে নিজে পুথি নকল করতেন অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্তকে দিয়ে পুথি নকল করিয়ে নিতেন। তাছাড়া, সেকালে মঠে-মন্দিরে পুথিদান পুণ্যকর্ম বিবেচিত হত। এজন্য বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান—যথা, হিন্দুদের মন্দির, বৌদ্ধদের বিহার ও জৈনদের উপাশ্রয়গুলি পুথিশালায় পরিণত হয়েছিল। এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ত প্রতিষ্ঠানে পুথি বিনিময় করা হত এবং এই

ভাবে '৮৫০খ্রী: হইতে ১০০০ খ্রী: মধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র পুথিসংগ্রহ একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল' (প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য : অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃ. ১২২)। তাছাড়া অনেক সময় বিদেশী পর্যটকেরা এসে পুথি নকল করে নিয়ে যেতেন। ছাপাখানা চালু হবার আগে হাতে লেখা পুথিই ছিল বিদ্যাচর্চা বা শাস্ত্রচর্চার অন্যতম প্রধান উপকরণ। তাই পুথিকে অবলম্বন করে একদিকে যেমন কাগজশিল্প গড়ে উঠেছিল, অন্যদিকে তেমনি লিপিকর নামে একটি পেশাদার মসীজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা সমাজে রূঢ়মূল হয়েছিল। এইভাবে পুথিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে একটি সারস্বত কুটিরশিল্পের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল।

উপকরণের দিক থেকে বাংলা দেশের পুথিশিল্প মোটামুটি সর্বভারতীয় ঐতিহ্যেরই অনুগামী। লেখার কাজে তালপাতা [পাততাড়ি—তাড়ি (<তালী)-র পাত], কলাপাতা, ভূর্জপাতা ও তেরেট পাতা ব্যবহৃত হত। কলাপাতা অবশ্য পাঠশালার ছাত্ররা ব্যবহার করত, আর ভূর্জপাতে লেখা হত কবচাদির ভেতরকার গুহ্য মন্ত্র। তেরেট তালপাতার চেয়ে বেশি লম্বা ও টেকসই। মুকুন্দরামের পৈতৃক বাসভূমি দামিন্যায় রক্ষিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুথিটি 'তেরেট পাতায় লেখা। মাঝে মাঝে লাল কালিতে লেখা আছে, বোধ করি মাহাত্ম্য-অর্পণের উদ্দেশ্যে।...চামড়ার পাটা' (বা-সা-ই, ১ম/ পূর্বার্ধ, সুকুমার সেন, পৃ. ৫১৪।' তবে তেরেট পাতার চেয়ে তালপাতা ও তুলট কাগজই পুথির জন্য বেশি ব্যবহৃত হত। বোধহয় ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই পূজাপদ্ধতি ও শাস্ত্রগ্রন্থের পুথি তালপাতায় লেখা হত। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে কালকেতুর রাজ্যে মুসলমান উপনিবিষ্টদের মধ্যে 'কাগজী' (পাঠান্তরে 'কাগতি') নামে এক শ্রেণীর কাগজ-প্রস্তুতকারী বৃত্তিধরের উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় মধ্যযুগের কাগজশিল্পে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। হয়ত বিধর্মী-সংস্রব এড়াবার জন্যই শাস্ত্রগ্রন্থাদি কাগজে না লিখে তালপাতায় লেখা হত। পুথিতে যে তালপাতা ব্যবহার করা হত, তা গাছ থেকে কেটে প্রথমে শুকিয়ে তারপর সিদ্ধ করে কিংবা দীর্ঘকাল জলে ভিজিয়ে রেখে আবার শুকিয়ে নেওয়া হত। তারপর পুথির আকারে কেটে নিয়ে লেখার আগে তাতে তেলা পাথর বা শাঁখ ঘসে পাতাগুলো মসৃণ করা হত। কাগজীপুথিতে হাতে তৈরী তুলট কাগজই ব্যবহৃত হত, তবে আঠারো শতকের

শেষ দিকে এক ধরনের পাতলা মাড়ের কাগজ ব্যবহৃত হতে থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দী শুরু হবার আগেই কোন কোন ক্ষেত্রে কলের কাগজ ব্যবহৃত হতে থাকে।[১] হাতে তৈরী কাগজের নির্দিষ্ট আকার না থাকায় পুরনো পুথির আকারেও বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পুথির পাতাগুলি সর্বভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে কাঠের পাটা বা চামড়ার খোলের মধ্যে বাঁধা থাকত। তবে নির্দিষ্ট মাপের কলের কাগজ ব্যবহৃত হবার পর উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কোন কোন পুথিতে আধুনিক সেলাইপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। শ্রীরামপুরের কেরী লাইব্রেরিতে এই ধরনের কয়েকটি সেলাই-করা পুথি রক্ষিত আছে।

পুথি লেখার জন্য চাল-পোড়ানো ভুষা কালি ও নানা রকম গাছের রস থেকে তৈরি কষকালি ব্যবহৃত হত।[১ক] লেখার সময় পুথির পাতায় অতিরিক্ত কালি পড়ে গেলে ঐ কালি শুষে নেবার জন্য বালির পুঁটুলি ব্যবহার করা হত। লেখনী হিসেবে ব্যবহৃত হত কঞ্চি, খাগ ও পাখির পালক।

পুথি নকল করা মধ্যযুগের মসীজীবী সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা ছিল। নির্দিষ্ট পরিশ্রমিকের বিনিময়ে লিপিকরেরা মূল পুথি থেকে তার 'কপি' তৈরি করে দিতেন। কখনো কখনো লিপিকরেরা 'নিজের কারণে' অর্থাৎ নিজের ব্যবহারের জন্য পুথি লিখতেন। পুথি লেখার কাজে স্ত্রী-পুরুষ বা হিন্দু-মুসলমানের জাতিভেদ ছিল না। গোড়ার দিকে বাংলা লেখার ব্যাপারে মুসলমান কবি ও লিপিকরদের কিছুটা ধর্মীয় অস্বস্তি ছিল।[২] কিন্তু ষোড়শ শতকের পর থেকে মুসলমানেরাও বাংলা পুথি তৈরী করেছেন। মুসলমান লিপিকরেরা শুধু ইসলামী পুথিই নকল করেন নি, কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু কাব্যও নকল করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত মহাভারতের তিনখানি পুথির লিপিকর শেখ জামাল মাহমুদ। শুধু পুথি নকল করাই নয়, নকলকরা পুথির মূলানুগত্য পরীক্ষা করা ও উপযুক্ত সংশোধন করাও লিপিকরদের উপজীবিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা বা জমিদারদের পুথিশালার জন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। এঁদের পদবী ছিল 'গাঁথাইত'। পুথিশালার নাম ছিল 'গাঁথাঘর'।

২. পুথির চিহ্নাবলী

বাংলা পুথির কোন নির্দিষ্ট মাপ নেই, তবে পাতার সাধারণ মাপ দৈর্ঘ্যে ১০"—১৮" ও প্রস্থে ৪"—৮"। প্রত্যেক পাতায় দুই পৃষ্ঠা। সাধারণতঃ সম্মুখ পৃষ্ঠায় কোন পত্রাঙ্ক থাকে না, পত্রাঙ্ক থাকে পশ্চাৎ পৃষ্ঠায়। পুথির যে পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক নেই, সেই পৃষ্ঠাকে পরবর্তী পত্রাঙ্কযুক্ত পৃষ্ঠার পূর্ব পৃষ্ঠা বলে ধরে নেওয়া হয় [এ কালে পুথি সম্পাদনার সময় সম্পাদকেরা পত্রাঙ্কহীন সম্মুখ পৃষ্ঠাকে 'ক' বা -।১ এবং পত্রাঙ্কযুক্ত পশ্চাৎপৃষ্ঠাকে 'খ' বা -।২ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ পত্রাঙ্কটি ১০ হলে পত্রাঙ্কহীন সম্মুখ পৃষ্ঠাটির সংখ্যা ১০।ক বা ১০।১, পত্রাঙ্কযুক্ত পশ্চাৎ পৃষ্ঠাটি ১০।খ বা ১০।২) বলে উল্লেখ করে থাকেন।] তবে কোথাও কোথাও এই রীতির ক্বচিৎ ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার বাংলা একাডেমিতে রক্ষিত 'সতী ময়না লোর চন্দ্রাণী'র একটি পুথিতে পাতার সম্মুখ পৃষ্ঠাতেই পত্রাঙ্ক দেওয়া আছে। এই রীতি দক্ষিণ ভারতের পুথিতে সর্বব্যাপী।

পত্রাঙ্ক পাতার উপরে বা পাশে লেখা থাকে। কখনো কখনো বন্ধন-সূত্রের জন্য রাখা মাঝখানের বর্গাকৃতি ফাঁকা জায়গাতেও অতিরিক্ত পত্রাঙ্ক লেখা থাকে (দ্রষ্টব্য : বর্ধমান সাহিত্যসভায় রক্ষিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মাধবপুর পুথি)। পত্রাঙ্ক লেখার আর একটি বিশিষ্ট রীতি হচ্ছে, পৃষ্ঠার ডান দিকের মার্জিনে সংখ্যায় পত্রাঙ্ক লেখা এবং বাঁ দিকের মার্জিনে টাকা-আনার চিহ্নে পত্রাঙ্ক নির্দেশ করা অর্থাৎ পত্রাঙ্ক দশ হলে ডান দিকের মার্জিনে ১০, বাঁ দিকের মার্জিনে ॥৶০ ; পত্রাঙ্ক একশো হলে ডান দিকের মার্জিনে ১০০, বাঁ দিকের মার্জিনে ৬।০ [১৲=১৬ আনা হিসাবে ৬৲×১৬=৯৬ আনা+।০ (=৪ আনা) =১০০] লেখা থাকবে। এই পত্রাঙ্ক ধরেই পুথির পত্রসংখ্যা (Folio number) নির্ণয় করা হয়। কোন কোন পুথিতে আবার পত্রাঙ্ক থাকে না, প্রত্যেক পাতার পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় পরবর্তী পাতার সম্মুখ পৃষ্ঠার প্রথম অংশ লিখে লিপিকর পুথির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন। তবে এই ধরনের পুথির চেয়ে পত্রাঙ্ক-বিশিষ্ট পুথির সংখ্যাই বেশি।

একালে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের গোড়ায় যেমন সামান্য একটু খাঁজ রাখা হয়, পুথিতে তেমন কোন আনুচ্ছেদিক খাঁজ বা paragraphic indention নেই। চার পাশে মার্জিন রেখে অক্ষরগুলি একটানা লেখা হত (অর্বাচীন পুথিতে অবশ্য পদের মাঝে ব্যবধান দেখা যায়। এটা হয়ত ছাপা বইয়ের প্রভাবজনিত)।

আর একটি ব্যাপারেও একালের ছাপা পদ্যের চরণবিন্যাসের সঙ্গে সেকালের পুথির চরণবিন্যাসের তফাত লক্ষ্য করা যায়। একালে পদ্যে যে কয়টি চরণ (line), পাতাতেও সেই কয়টি ছত্র (row), কিন্তু পুথিতে পদ্যের চরণসংখ্যা ও ছত্রসংখ্যা এক ছিল না। পুথিতে চরণদৈর্ঘ্যের সমতার পরিবর্তে প্রত্যেক পাতার ছত্রদৈর্ঘ্যের সমতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। এইজন্য ছত্রদৈর্ঘ্যের সমতা বজায় রাখতে গিয়ে প্রায়ই পূর্বছত্রের শব্দকে অস্থানে ভেঙে পরের ছত্রে আনা হত। পুথির মাঝখানে বন্ধনসূত্রের জন্য জায়গা ফাঁকা রাখতেও অস্থানে শব্দবিশ্লেষ করা হত। পুথিপাঠককে পড়ার সময় ঠিক জায়গায় শব্দবিশ্লেষ বা বর্ণ যোজনা করে নিতে হত। এই অনবচ্ছিন্ন লিপিধারা (scriptura continua) একালের অনভ্যস্ত পুথিপাঠকের কাছে নানা ধরনের শব্দবিশ্লেষ ও বর্ণযোজনার সম্ভাবনা প্রসারিত করে একই পুথির নানা পাঠান্তর সৃষ্টি করে। যেমন: চর্যার পুথির ২৮।ক-সংখ্যক পৃষ্ঠায় একটানা লেখা আছে 'কাজণকারণসস [বন্ধনসূত্রের জন্য ফাঁক] হরটালিউ'।। —এই অবিচ্ছিন্ন লিপিধারা থেকে তিনটি ভিন্ন ধরনের পাঠ নির্দেশিত হয়েছে: (১) কাজণ কারণ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী), (২) কাজ ণ কার ণ (প্রবোধচন্দ্র বাগচী) (৩) কাজ ণ কারণ (মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুকুমার সেন)।

পুথিতে লিপিধারা অবিচ্ছিন্ন হলেও বিরামচিহ্নের সাহায্যে পদ্যের চরণ-সমাপ্তি বোঝানো হত। পুথিতে বহু-প্রচলিত বিরামচিহ্ন হচ্ছে এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (।।)। তবে এই দাঁড়ি-ব্যবহারেও কিছু বৈচিত্র্য আছে। যেমন: (১) প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি।, দ্বিতীয় চরণের শেষে দুই দাঁড়ি।।; (২) প্রথম চরণের শেষে ফুটকি ও এক দাঁড়ি•।, দ্বিতীয় চরণের শেষে ফুটকি ও দুই দাঁড়ি•।। [যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি]; (৩) কোন কোন ক্ষেত্রে দুই চরণেই দুই দাঁড়ি বসে, এটি অনবধানপ্রসূতও হতে পারে, (৪) কোথাও কোথাও দুই চরণের এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির আগে-পিছে মোট দুই জোড়া ফুটকি বসে, যেমন, আচড়িয়া জতনে বান্ধিল চাঁচর কেস :।: বসনভূসন দিয়া কোরিল যুবেস :।।: [প্রসাদচরিত্র, রবীন্দ্রভারতী-পুথি]।

যেখানে একটি স্তবক শেষ হয় অর্থাৎ যেখানে ভণিতা থাকে সেখানে দ্বিতীয় চরণের শেষে দুইবার দুই দাঁড়ি বসে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দাঁড়ি-যুগ্মকের মধ্যে গোল পুষ্পাকৃতি চিহ্ন (*) বা অন্য ধরনের চিহ্ন বসে (যেমন ।।*।।, দ্র. বর্ধমান

সাহিত্যসভায় রক্ষিত মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের পুথি)। কোন কোন পুথিতে ত্রিপদী পত্তের প্রথম দুই পর্বের শেষে ইংরেজি colon চিহ্নের মত : চিহ্ন দিয়ে পর্বভাগ বোঝানো হয়েছে, যেমন :

বল্লুকানদিরতিরে : দেবতা অসুরনরে : চারিপণ্ডিতপুজেনিরঞ্জন। ঘনপড়েসঙ্খ ধ্বনিঃ দুরেহইতেভালসুনিঃ উল্লসিতসকলভুবন॥[রূপরামের ধর্মমঙ্গল পৃ ২।ক, রবীন্দ্রভারতী-পুথি ১৫)।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্তবকের প্রত্যেক পদের শেষে (অর্থাৎ প্রতি দুই চরণের শেষে) পদের ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে। দ্বিতীয় পদটি ধ্রুবপদ, ধ্রুবপদের জায়গায় দুটি দাঁড়িযুগ্মকের মাঝে ॥ ধ্রু ॥ লেখা থাকে, ধ্রুবপদকে বাদ দিয়ে পদের ক্রমিক সংখ্যা বসানো হয় অর্থাৎ স্তবকের দ্বিতীয় চরণের শেষে ॥ ১ ॥, চতুর্থ চরণের শেষে॥ ধ্রু ॥, ষষ্ঠ চরণের শেষে ॥ ২ ॥ ইত্যাদি [দ্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি]। কোন কোন ক্ষেত্রে স্তবকের শেষে স্তবক-সমাপ্তি-চিহ্নের পর দুটি জোড়া দাঁড়ির মাঝে স্তবকের ক্রমসংখ্যা বসানো থাকে [দ্র. রূপরামের ধর্মমঙ্গল, রবীন্দ্রভারতী-পুথি ১৫]।

বিরামচিহ্ন ছাড়াও পুথিতে আর এক ধরনের সংকেতচিহ্ন পাওয়া যায়, এগুলো হচ্ছে নানা ধরনের সংশোধনচিহ্ন (caret)। লেখা হয়ে যাবার পর কোন অক্ষর বা চরণে ভুল ধরা পড়লে লিপিকর বা সংশোধনকারী পুথির নির্দিষ্ট জায়গায় এইসব চিহ্ন বসিয়ে সেই অক্ষর বা পঙ্‌ক্তির উপরে, নীচে বা পাশে সংশোধিত বা সংযোজিত অংশ লিখে দিতেন। পুথিতে প্রধানতঃ তিন ধরনের সংশোধন লক্ষ্য করা যায় : (১) ভুল অংশকে কেটে তার জায়গায় শুদ্ধ অংশ বসানো, (২) ভুল করে একই কথা দুবার লিখলে একটি অংশকে কেটে দেওয়া, (৩) কোন অংশ বাদ পড়ে গেলে তার উপরে, নীচে বা পাশে পরিত্যক্ত অংশ লিখে দেওয়া। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কাটা চিহ্ন (×), যোগচিহ্ন,অর্ধচন্দ্র (‿) কাকপদ (Λ), বিসর্গ (:) ইত্যাদি চিহ্ন বসানো হত। যেমন, চর্যার পুথির ৪।ক পৃষ্ঠায় প্রথম ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে দুটি সংশোধন আছে—প্রথম পঙ্‌ক্তিতে প্রথমে লেখা ছিল 'ঘণ্টাচ্ছন্দ', সংশোধক 'ঘণ্টা'-র উপরে অর্ধচন্দ্র চিহ্ন (‿) দিয়ে তার উপর 'পশ্চা' লিখে বোঝাতে চেয়েছেন কথাটি 'ঘণ্টাচ্ছন্দ' নয় 'পশ্চাচ্ছন্দ', আবার পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে লেখা আছে 'তথাচামে', কিন্তু কথাটি হবে 'তথাচাগমে', অর্থাৎ 'চা' ও 'মে'-র

মধ্যবর্তী 'গ' বর্ণটি বাদ পড়েছে, তাই 'চা' ও 'মে'-র মাঝে নীচের দিকে কাকপদ (Λ) বসিয়ে তার নীচে 'গ' লেখা হয়েছে, সংযোজিত 'গ'-এর আগে পিছে আবার সংযোজন-চিহ্ন আছে। ঐ পুথির ১৬।খ পৃষ্ঠায় ১০ সংখ্যক চর্যার পাঠে দেখা যায় 'ডোম্বীথাঅমোলানণ' লিখে 'ন' টি কেটে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ কথাটি 'মোলাণ'; লিপিকর বা সংশোধক 'ন' বর্ণটি কেটে দিয়ে পাঠ শুদ্ধ করেছেন। চর্যাপুথির ১১।ক পৃষ্ঠায় আর এক ধরনের সংশোধনের নজির আছে, এখানে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'প্রকর্ষবশাদাশ্বাসংদদাগ্রহনহরতি' লিখে 'দদাগ্রহনহরতি' অংশটি কেটে দেওয়া হয়েছে এবং কাটা অংশের পাশে বিসর্গচিহ্ন (:) বসানো হয়েছে এবং পুথির ওপরের মার্জিনে প্রথম পঙ্‌ক্তির উপরে কাটা অংশের প্রায় সমান্তরাল অংশে সংশোধিত পাঠ 'ভো চিত্তহরিণ' লেখা হয়েছে, অর্থাৎ অংশটির শুদ্ধ পাঠ 'প্রকর্ষবশাদাশ্বাসং ভো চিত্তহরিণ'। এই সংশোধিত বা সংযোজিত পাঠকে বলে 'তোলা পাঠ' (adscript)। চর্যাপুথিতে যেভাবে 'তোলা পাঠ' লেখা হয়েছে তা কিছুটা অসুবিধাজনক, কারণ এ থেকে সহসা বোঝা যায় না যে তোলা পাঠটি পৃষ্ঠার কোন্ অংশের সঙ্গে যুক্ত। এর তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে তোলা পাঠের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। সেখানে পৃষ্ঠার কোন্ পঙ্‌ক্তিতে তোলা পাঠ বসবে তা মার্জিনে লেখা তোলা পাঠের পাশে উদ্দিষ্ট পঙ্‌ক্তির ক্রম-সংখ্যা বসিয়ে বোঝানো হয়েছে এবং পঙ্‌ক্তির মধ্যে যেখানে তোলাপাঠ বসবে সেখানে ছাড়-চিহ্ন হিসাবে অর্ধচন্দ্র-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেমন, পুথির ৯২।খ পৃষ্ঠার ২য় পঙ্‌ক্তিতে দুটি সংশোধন আছে—ঐ পঙ্‌ক্তির শুরুতে আছে '-জাইআঁরূপারভাগুতঘী', পুথিতে 'ভাগুত' কেটে 'ভাগে' করা হয়েছে ও 'ত'-র মাথায় বর্জনচিহ্ন দিয়ে 'ত' বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া 'ত' ও 'ঘী-র মাঝামাঝি মাথার দিকে অর্ধচন্দ্র চিহ্ন আছে। এ থেকে বোঝা যায় এখানে কিছু অংশ বাদ পড়েছে। ওদিকে পুথির উপরের মার্জিনে প্রথম পঙ্‌ক্তির উপরে এই অংশের সমান্তরাল জায়গায় লেখা আছে 'সজাইল ২', অর্থাৎ 'সজাইল' পদটি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ছাড়-চিহ্নিত অংশে বসবে; কাজেই এই অংশের পূর্ণপাঠ 'রূপার ভাণ্ডে সজাইল ঘী' এবং 'সজাইল' হচ্ছে এই অংশের তোলা পাঠ।

৩. পুথির 'পুষ্পিকা'

মূল রচনার অনুলিখন সমাপ্ত হবার পর মূল পুথির সঙ্গে লিপিকর আরও কয়েক-ছত্র যোগ করে দিতেন। এই সংযোজিত অংশের নাম 'পুষ্পিকা' (colophon)। 'পুষ্পিকা' অংশে সংশ্লিষ্ট লিপিকর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়, হয়ত এইজন্যই এই অংশের নাম 'পুষ্পিকা' [তু. দিবাদিগণীয় √পুষ্প্‌=বিকশিত হওয়া>প্রকাশ করা]। পুষ্পিকায় লিপিকরের নাম, লিপিকর্মের স্থান ও লিপিকর্ম-সমাপ্তির সময় উল্লিখিত হয়, যেমন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৪৬১ নং পুথি [রূপরামের ধর্মমঙ্গল]র পুষ্পিকা : 'ইতি বারুইপালা সমাপ্ত লিখিতং শ্রীখেলারাম সরকার সাং ভগনদিঘি ইতি সন ১২৭১ সাল তারিখ ২৫ ভাদ্র রোজ যুক্রবার বেলা আন্ধারী [?] এক পহর।' কোন কোন পুষ্পিকায় পুথির মালিক ও পাঠকের নামও উল্লিখিত থাকে, যেমন 'এ পুস্তক শ্রীরামজয়দেব সম্মা। নিবাস বিরসিংহো পরগনে। বিষ্টুপুর লাট কাকটা জেলা জঙ্গলমহল সন ১২৩৭ সাল' [মহাভারত, রবীন্দ্রভারতী পুথি নং ৩], এই পুথির লিপিকর 'শ্রীকালিচরণ দাস ঘোষ'। আর একটি পুষ্পিকা : 'লিখিতং শ্রীকৃষ্ণমোহন দাষ হাজারি পাঠক শ্রীপরান ঘোস সাঃ মাজুর্‍্যা। ইতি সন ১২২৭ সাল তারিখ ২২ আসাড় বার মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের ওক্তে সমাপ্ত হইল' [ক. বি. পুথি ৩৬৯৮]। কোন পুষ্পিকায় পারিশ্রমিক বা পুথি-ভাড়ার উল্লেখ থাকে : 'জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিয়োকো দোসক নাস্তি॥ সন ১০৩৯ সাল তাং ১ পোষ সক্ষাক্ষর শ্রীপরুসরাম ঘোষ এ পুস্তক পঠন করিতে দিলাঙ শ্রীনিমু কলুকে দক্ষিনা টং ৵০ দুই আনা দিবে [রবীন্দ্রভারতী পুথি ১৫]। কোন পুষ্পিকায় পুথিচোরের উদ্দেশে অভিসম্পাত : 'এ পুস্তক জে চুরি করিবেক কিম্বা মাগিয়া লয়্যা জায় জত্তপী নাই দেই তাহাকে গো হর্ত্তা ব্রহ্মহর্ত্তা স্ত্রীহর্ত্তার পাতক লাগে॥ এবং মাত্রি হরণ করে॥ এই মত তাল্বাক' [শ্রীত্রিপুরা বসুর প্রবন্ধ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৮৪, সংখ্যা ৩-৪, পৃ. ২৪]।

পুথির পুষ্পিকা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এতে সমকালীন সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে যেমন নানা মূল্যবান তথ্যের আভাস পাওয়া যায়, তেমনি সংশ্লিষ্ট পুথি ও কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কেও নানা মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির শেষাংশ না পাওয়ায় পুষ্পিকার অভাবে পুথির লিপিকাল, লিপিকর ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। এই পুথির পুষ্পিকা

পাওয়া গেলে হয়ত 'চণ্ডীদাস-সমস্যা'রও সহজ সমাধান হতে পারত। অন্যদিকে চর্যাপুথিরও শেষাংশ তথা পুষ্পিকা-অংশ পাওয়া যায় নি, কিন্তু পরবর্তী কালে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'র তিব্বতী অনুবাদের যে পুথি পাওয়া গিয়েছে তার পুষ্পিকা থেকে 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য জানা গিয়েছে।

৪. পুথির কালাঙ্ক

পুথির শেষ দিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লিখিত থাকে, সেটি হলো কালাঙ্ক। কবি কাব্যরচনা শেষ করে একেবারে শেষ অংশে কোন্ সময়ে কাব্য লেখা শুরু ও শেষ করলেন তা লিখে দিতেন, তবে তারিখটি সরাসরি উল্লেখ করতেন না। উল্লেখ্য বর্ষটিতে যে কয়টি সংখ্যা (digit) আছে সেই কয়টি সংখ্যার প্রতীক প্রতিশব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন ৭ সংখ্যাটি উল্লেখ করতে হলে ৭ ব্যবহার না করে ৭-এর জায়গায় 'সমুদ্র' (৭=সাত সমুদ্র) ব্যবহার করতেন। তবে প্রতীক শব্দগুলি পর পর বাঁদিক থেকে ডান দিকে না বসিয়ে, অঙ্কের গতি যেহেতু ডান দিক থেকে বাঁদিকে (অঙ্কস্য বামা গতিঃ) সেইজন্য প্রতীক শব্দগুলিও ডান দিক থেকে বাঁদিকে সাজিয়ে দিতেন, তাই গণনা করার সময় সংখ্যাগুলি বের করে নিয়ে তার ক্রম উলটে নিতে হয়। যেমন, ভারতচন্দ্রের কাব্যে 'বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা'—এখানে বেদ=৪, ঋষি=৭, রস=৬, ব্রহ্ম=১, অর্থাৎ ৪৭৬১, একে উল্টে নিলেই ঈপ্সিত বর্ষাঙ্কটি পাওয়া যাবে: ১৬৭৪ শকাব্দ।

কাজেই কালাঙ্ক নির্ণয় করতে গেলে প্রতীক শব্দগুলির অর্থ জানা দরকার। নীচে বর্ণানুক্রমিক ভাবে এই ধরনের প্রতীক শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হলো:

অক্ষ [=ইন্দ্রিয়]–৫। অক্ষর–১,৫০ (স্বরবর্ণ+ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা)। অগ্নি–৩ (সূর্য, বজ্র ও আগুন—অগ্নির এই তিন রূপ)। অঙ্ক–২, ৯। অঙ্গ–৬ (বেদের ষড়ঙ্গ), ৮ (অষ্টাঙ্গ), ৯ (বৈষ্ণবদের নবাঙ্গ ভক্তি)। অজ [=ব্রহ্ম]–১। অনল–৩। অন্ত–৯। অন্তরীক্ষ–০। অব্ধি–৭। অভ্র–০।

অম্বর—০। আদি—০। ইন্দু—১। ইষু—৫। ঈশান—১১। উদধি—৭। ঋতু—৬। ঋষি—৭। কর, করতল—২। কলমী—১০ (দশমী তিথিতে কলমী শাক ভক্ষণ নিষিদ্ধ)। কলা—১৬। কাল—৩। কোল—২। গজ—৮। গুণ—৩। গুরু—১। গ্রহ—৯। চন্দ্র—১। চন্দ্রকলা—১৬। চারিবেদ—১৬। জলধি, জলনিধি—৭। দিক—১০। দ্বার—৯ (মনুষ্যদেহের ছিদ্র বা দ্বারের সংখ্যা ৯)। দ্বিজরাজ [=চন্দ্র]—১। ধাতা—১। নব—৯। নিধি—৯। নিশাকর, নিশাপতি [=চন্দ্র]—১। নেত্র—৩। পক্ষ, পাখা—২। পুষ্প—০ (ফুল আঁকতে শূন্যের মত গোল চিহ্ন আঁকতে হয়)। পুঁইশাক—১২ (দ্বাদশীতে পুঁইশাক ভক্ষণ নিষিদ্ধ)। বসু—৮। বস্তু [=বিষয়]—৫। বাণ—৫। বায়ু—৫,৪৯। বাহু—২। বিধু—১। বিন্দু—০। বেদ—৪। বেদগুণ—(৪×৩)=১২। ব্রহ্ম, ব্রহ্মা—১। ভানু—১২ (১২ মাসে সূর্যের ১২টি রূপ)। ভাস [=দৃষ্টি]—২। ভাস্কর—১২। ভুজ—২। ভুবন—১৪। ভুরু, ভ্রূ—২। ভূমি—১। মহী—১। মুনি—৭। মৃগাঙ্ক—১। যুগ—৪। রন্ধ্র—০, ৯। রস—৬ (অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু ও লবণভেদে রস বা স্বাদ ৬ রকম)। রাম—৩ (পরশুরাম, দাশরথিরাম, বলরাম)। রুক্মিণীনন্দন [=কাম=পঞ্চশর]—৫। রুদ্র—১১। শর—৫। শশী—১। শাক—১০ (দশমীতে শাকভক্ষণ নিষিদ্ধ)। শীম—১১ (একাদশীতে শীমভক্ষণ নিষিদ্ধ)। শূন্য—০। সমুদ্র, সাগর, সিন্ধু—৭। সিদ্ধ—৭ (সপ্ত সিদ্ধ ঋষি), ২৪ ('সিদ্ধ=জিন=২৪ চিরপ্রসিদ্ধ')। সিদ্ধি—৮। সুধাকর, সোম—১। স্বর—৭। স্বামী—৭ (প্রাচীন ভারতে রাজ্যের যে ৭টি অঙ্গ কল্পনা করা হত, তার গোড়ায় ছিল স্বামী বা রাজা। এই হিসাবে স্বামী=৭)। হিম, হিমাংশু—১।

সাধারণভাবে এই সব প্রতীক শব্দ বিশ্লেষণ করলেই উদ্দিষ্ট সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের কবিরা কালাঙ্ক নির্দেশের ব্যাপারে তেমন কোন জটিলতার পরিচয় দেন নি। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অনেক কবি কালাঙ্ক নির্দেশের ব্যাপারে নানারকম চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবতঃ এই চাতুর্য ঐ সময়কার অবক্ষয়ী সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্য বহিঃপ্রসাধন-প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই সময়ের কবিরা অনেক সময় অঙ্কের বামা গতি অস্বীকার করে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করেছেন। যেমন, রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের কালাঙ্ক :

শাকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে ॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।···

এই অঙ্কের সমাধান করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন: "চন্দ্রকলা = ১৬। রাম = ৩। করতল (কর) = ২। অতএব দক্ষিণাগতিতে শকটি ১৬৩২। কিন্তু 'বাম হল্য বিধিকান্ত' অর্থ কি? কবি বলিতেছেন, অঙ্কের বামাগতি,—এই বিধি। কিন্তু এখানে সে বিধিরূপ কান্ত বাম কি-না বক্র হইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছে। অর্থাৎ, দক্ষিণাগতি ধরিবে" (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৬)। এই রকম চাতুর্যপূর্ণ আর একটি কালাঙ্ক রূপরামের ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়:

সাকে সিমে জড় হৈলে জত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয় ॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই সকে গিত হৈল লেখা কর্য্যা লহ ॥

এর ব্যাখ্যায় যোগেশচন্দ্র লিখেছেন:

"শাকে শীমে = ১০ × ১১ = ১১০
চারি বাণ (২০) তিন যুগ (১২)
বেদ (৪) = ২০ + ১২ + ৪ = ৩৬
১৪৬

'রসের উপরে রস', ১৪৬ অঙ্কের ৬ অঙ্কে রস এই ৬ অঙ্কে ৬ যোগ করিতে হইবে,

৬
১৪৬
১৫২

'তাহে রস দেহ'

১৫২৬ শক" (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৬)।

কোন কোন ক্ষেত্রে কবিরা অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে কাব্যরচনার দিনক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, যেমন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে:

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে শকাব্দের উল্লেখ: রাম (৩), গুণ (৩), রস (৬), সুধাকর (১) = ১৬৩৩ শকাব্দ। পরের তিন পঙ্‌ক্তিতে মাস, দিন, ক্ষণের উল্লেখ: মার্গক = অগ্রহায়ণ মাস, মার্গকাদ্য অংশে হংস (= সূর্য) = অগ্রহায়ণ মাসের আদ্য অংশে সূর্য; ভার্গব বাসর = শুক্রবার। সুলক্ষ = সুলক্ষণ, বলক্ষ = সাদা, শুক্ল; সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ = সুলক্ষণ বা শুভ শুক্ল পক্ষ, তৃতীয়াখ্য তিথি = শুক্লা তৃতীয়া; যাম (= ৮) সংখ্য দিনে = ৮ম দিনে (মতান্তরে ৮ম দণ্ডে)। অর্থাৎ ১৬৩৩ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ১লা (মতান্তরে ৮ই) তারিখে শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়ার প্রথম প্রহরে (মতান্তরে ৮ম দণ্ডে) ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়।

দিন ও মাসের নাম নির্দেশেও কবিরা নানা রকম কৌশলপূর্ণ প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন, রবিবার = আদিত্যবার; মঙ্গলবার = মহীপুত্র তিথি[৩], অঙ্গারক বার[৪]; বৃহস্পতিবার = গুরুবার; শুক্রবার = ভার্গববার। মাসের নামের ক্ষেত্রে অনেক সময় রাশিচক্রে রাশিবিশেষের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট, মাসকেও সেই সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, ভাদ্র মাস বোঝাতে গিয়ে কবি বলবেন সিংহমাস। কারণ রাশিচক্রে সিংহ ৫ম রাশি আর মাসের মধ্যে ভাদ্রের স্থানও ৫ম। এই রকম একটি কৌশলপূর্ণ কালাঙ্ক খেলারামের ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়:

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

এখানে, ভুবন = ১৪, বায়ু = ৪৯, শরের বাহন = ধনু, মাস শরের বাহন = ধনু মাস = ৯ম মাস = পৌষ মাস। অর্থাৎ ১৪৪৯ শকের পৌষ মাসে খেলারাম গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন।

রাশিচক্রের অবস্থান অনুসারে রাশিগুলির সংখ্যাক্রম এই রকম: মেষ ১, বৃষ ২, মিথুন ৩, কর্কট ৪, সিংহ ৫, কন্যা ৬, তুলা ৭, বৃশ্চিক ৮, ধনু ৯, মকর ১০, কুম্ভ ১১, মীন ১২।

বাংলা পুথির কালাঙ্কে যে বর্ষসংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটি সাধারণতঃ শকাব্দ

নির্দেশ করে। শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। তবে অন্য ধরনের অব্দ বা বর্ষাঙ্কও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, সেগুলিকে নিম্নোক্তরূপে খ্রীস্টাব্দে পরিণত করা যায়। যেমন :

অমলি সাল [উড়িষ্যা-সংশ্লিষ্ট পুথিতে প্রাপ্তব্য]+৫৯৩=খ্রীস্টাব্দ।
[অমলি সাল বঙ্গাব্দ থেকে ৫ মাস কম]

ত্রিপুরাব্দ [ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত]+৫৯০ =খ্রীস্টাব্দ।
নেপাল সংবৎ+৮৮০ =খ্রীস্টাব্দ।
বঙ্গাব্দ+৫৯৩ =খ্রীস্টাব্দ।
মঘী সন [চট্টগ্রাম-আরাকানের পুথিতে প্রাপ্তব্য]+৬৩৮=খ্রীস্টাব্দ।
মল্লাব্দ [মল্লভূমের পুথিতে প্রাপ্তব্য]+৬৯৬ =খ্রীস্টাব্দ।
লক্ষ্মণাব্দ+১১১৮ =খ্রীস্টাব্দ।
শকাব্দ+৭৮ =খ্রীস্টাব্দ।
সংবৎ−৫৭ =খ্রীস্টাব্দ।

৫. পুথির প্রকারভেদ

পুথি দুধরনের হতে পারে: (১) কবি বা গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা (autographic text)। (২) গ্রন্থকারের নিজের হাতে লেখা পুথির প্রতিলিপি (transmitted text)। প্রথম শ্রেণীর পুথি খুবই দুর্লভ। অনেকে মনে করেন, গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যের পুথিখানি (১৭৫১) কবির স্বহস্তলিখিত।[৫] কিন্তু এ বিষয়েও মতভেদের অবকাশ আছে। বাংলাদেশের গবেষক ডঃ মযহারুল ইসলাম কবি হেয়াত মামুদের 'জঙ্গনামা' কাব্যের স্বহস্তলিপি আবিষ্কার করেছেন।[৬] কিন্তু এই সব স্বহস্তলিপি সংখ্যায় যেমন বিরল, প্রকৃতিতেও তেমনি সন্দেহাতীত নয়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আকর হিসাবে আমরা যেসব পুথি পাই, তার অধিকাংশই মূল পুথির প্রতিলিপি। এই সব প্রতিলিপির প্রত্যেকটিই অবশ্য কবির নিজের লেখা পুথি দেখে নকল করা নয়। প্রথমে হয়ত কবির স্বহস্তলিখিত পুথির

একাধিক প্রতিলিপি তৈরি করা হত। তারপর আবার সেইসব প্রতিলিপি থেকে নতুন নতুন প্রতিলিপি তৈরি করা হত। যে পুথি দেখে প্রতিলিপি তৈরি করা হত তাকে বলা হয় আদর্শ পুথি (exemplar)। সেযুগের লিপিকরেরা পুথি নকল করতে গিয়ে অসতর্কতা, বিভ্রান্তি, অজ্ঞতা প্রভৃতি কারণে অনেক সময় প্রতিলিপিতে নানা রকম ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটাতেন। ফলে আদর্শ পুথি ও অনুলিখিত পুথির মধ্যে প্রায়ই নানা অনৈক্য দেখা যায়। পুথিতে পাঠান্তরের সূত্রপাত এখান থেকেই। অনুলিখিত পুথি আদর্শ পুথি থেকে যত দূরবর্তী হয়, অনুলিখিত পুথিতে পাঠান্তরের সম্ভাবনাও তত বেড়ে যায়। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন পুথির দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যেতে পারে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথিশালায় রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ পালার একটি পুথি রক্ষিত আছে, পুথির লিপিকাল 'সন ১০৩৯ সাল' অর্থাৎ ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দ। কাব্যটি কবি-শকাঙ্ক অনুসারে ১৫২৬ শকাব্দ = ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত, তাহলে রবীন্দ্রভারতীর পুথিটি মূল কাব্য রচিত হবার ২৮ বছর পর অনুলিখিত। এই পালারই আর একটি পুথি (নং ৩৬৯৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। এই পুথির লিপিকাল "সন ১২২৭ সাল" = ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ, অর্থাৎ এটি মূল কাব্য রচিত হবার ২১৬ বছর পর অনুলিখিত। র-ভা-পুথির সঙ্গে ক.বি.-পুথি তুলনা করলে অনেক জায়গায় বিচ্যুতি ও অনৈক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সব বিচ্যুতি ও অনৈক্য থেকেই বোঝা যায় দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ক.বি পুথি আদর্শ পুথি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, তার তুলনায় র-ভা পুথি যদি কবির স্বহস্তলিপি না-ও হয় তবে অন্ততঃ আদর্শ লিপির যে অনেক কাছাকাছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অনুলিখিত পুথি প্রকৃতি অনুসারে মোটামুটি তিন রকম; (১) সুরক্ষিত প্রতিলিপি (protected transmission), (২) অরক্ষিত প্রতিলিপি (haphazard transmission), (৩) সংশোধিত প্রতিলিপি (revised transmission)।

যে পুথি আদর্শ পুথি অবলম্বনে কোন সতর্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অনুলিখিত হয়েছে, তাকে বলা যায় সুরক্ষিত প্রতিলিপি। স্বহস্তলিখিত পুথির মত সুরক্ষিত প্রতিলিপিও খুব দুর্লভ। অষ্টাদশ শতকের শেষে ও

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক সময় অনেক বাংলা ও সংস্কৃত পুথির প্রতিলিপি তৈরি করিয়েছেন। সেগুলোর অধিকাংশই এখন পাশ্চাত্যের পুথিশালায় রক্ষিত হয়েছে। এই ধরনের পুথিসংগ্রহে সুরক্ষিত প্রতিলিপি পাওয়া অসম্ভব নয়।

যে পুথি লিপিকরের স্বাধীন প্রচেষ্টায় অনুলিখিত হয় তাকে বলা যায় অরক্ষিত প্রতিলিপি। এই ধরনের অনুলিখনে লিপিকরের উপর কোন সতর্ক ব্যক্তির সজাগ তত্ত্বাবধান থাকে না বলে লিপিকরের অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি বা অসতর্কতার জন্য প্রতিলিপিতে অনেক রকম বিকৃতি ও বিচ্যুতি দেখা দেয়। ফলে আদর্শ পুথি থেকে এই পুথির ব্যবধানও অনেক বেড়ে যায়। বাংলায় এই ধরনের পুথির সংখ্যাই বেশী। ধর্মমঙ্গলের পূর্বোল্লিখিত ক.বি.পুথি (৩৬৯৮) এই ধরনের অরক্ষিত প্রতিলিপির উদাহরণ। এই পুথি আদর্শ পুথি থেকে বহু দূরবর্তী। লিপিকরও মনে হয় খুব বেশী শিক্ষিত ছিলেন না. তাঁর বিচারবুদ্ধিও খুব সতর্ক ছিল না, তাই যে পুথি দেখে তিনি নকল করেছিলেন তার যথাযথ পাঠোদ্ধার করতে না পেরে অনেক জায়গায় ভ্রান্ত পাঠ দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শ পুথির পঙ্‌ক্তিবিশেষ বাদও পড়েছে, যেমন, ৪।ক পৃষ্ঠায় 'ইছাই দেখিয়া [ ] জোড়া সিঙ্গা সারে।'-র পরবর্তী অপেক্ষিত পঙ্‌ক্তিটি পুথিতে নেই। অনুরূপ ভাবে ৬।ক পৃষ্ঠার একেবারে গোড়ায় 'সোনা' পদটির উল্লেখ দেখে বোঝা যায়, এর আগে দুটি ছত্র ছিল এবং 'সোনা' সেই ছত্রদ্বয়ের দ্বিতীয় ছত্রের শেষ পদ, কিন্তু ছত্রদ্বয়ের বাকী অংশ পুথিতে বাদ পড়েছে। এখানে যেমন আদর্শ পুথির পাঠ বাদ পড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তেমনি আবার বাড়তি পাঠও সংযোজিত হতে দেখা যায়। এই বাড়তি পাঠকে বলে 'প্রক্ষেপ' বা 'প্রক্ষিপ্ত পাঠ' (interpolation)।

কোন কোন ক্ষেত্রে পুথিতে সংশোধনের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। পুথি অনুলিখিত হবার পর লিপিকর নিজে কিংবা অন্য কোন পাঠপরীক্ষক হয় আদর্শ পুথির সঙ্গে তুলনা করে নতুবা নিজের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে অনুলিখিত পুথির পাঠভ্রমগুলি সংশোধন করে দিতেন। পুথির পাতাতেই সংশোধনীয় অক্ষর বা চরণের উপরে, নীচে বা পাশে সংশোধিত পাঠ লিখে দেওয়া হত। সংশোধিত পাঠযুক্ত প্রতিলিপিকে বলে সংশোধিত প্রতিলিপি। চর্যার পুথিতে বাংলা হরফে যেসব তোলা পাঠ পাওয়া যায় সেগুলি সম্ভবতঃ লিপিকরের

সংশোধন, কিন্তু নাগরী হরফের সংশোধন সম্ভবতঃ পরবর্তী পাঠ-পরীক্ষকের। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটিও সংশোধিত প্রতিলিপি। সংশোধিত পুথির সবচেয়ে ভাল উদাহরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত চণ্ডীমঙ্গলের ১০৮৬ সংখ্যক পুথি (লিপিকাল ১৬৩৮ শকাব্দ=১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ)। 'পুথিটিতে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি অন্য কোন পুরানো পুথিতে দেখি নাই। কোন কোন পৃষ্ঠায় মার্জিনে অন্য পুথি হইতে রূপান্তর, পাঠান্তর—এমন কি গোটা গোটা পদ—উদ্ধৃত দেখা যায়' (চণ্ডীমঙ্গল—সুকুমার সেন-সম্পাদিত, পৃ ৪)।

৬. পুথির পাঠভেদ ও পাঠবিকৃতি

পাঠভেদ সাধারণতঃ পূর্বোক্ত অরক্ষিত পুথিতেই দেখা যায় এবং সেই পাঠভেদ ঘটে নানা ধরনের পাঠবিকৃতি বা পাঠবিচ্যুতি থেকে। বিশ্লেষণ করলে এই পাঠবিকৃতির মধ্যে মোটামুটি চারটি ধারা লক্ষ্য করা যায় : (ক) বিপর্যয়, (খ) বর্জন, (গ) সংযোজন এবং (ঘ) মিশ্রণ।

ক. বিপর্যয় ঃ

লিপিকর আদর্শ পুথির পাঠ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে না পারলে অনুলিখিত পুথিতে আদর্শ পাঠের নানা বিপর্যয় ঘটে। এই বিপর্যয়ের একটা কারণ লিপিকরের বিভ্রান্তি। এই বিভ্রান্তি অনেক রকম হতে পারে, যেমন : (১) বর্ণবিভ্রান্তি : কোন কোন লিপিকর আদর্শ পুথির বর্ণ ঠিক মত বুঝতে না পারলে অনেক সময় মূল পাঠের নির্দিষ্ট বর্ণটি ব্যবহার না করে তিনি বর্ণটিকে যেভাবে চিনতেন সেইভাবে লিখে দিতেন। এতে লিপিকরের বিবেক পরিষ্কার থাকলেও পাঠের বিপর্যাস ও তজ্জনিত দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়। যেমন, ৩৬৯৮ নং ক.বি. পুথি (১৮২০ সালে অনুলিখিত)র ২।ক পৃষ্ঠায় এক জায়গায় আছে 'ইছের সমান মুনি মনোহর স্তব'—এখানে 'ইছের' কথাটি দুর্বোধ্য ; কিন্তু অন্য পুথির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় এখানে প্রকৃত পাঠটি হচ্ছে 'ইন্দ্রের'—'ইন্দ্রের সমান মুনি মনোহর স্তব'। ক.বি. পুথির লিপিকর আদর্শ পুথির 'ন্দ্র' বর্ণটিকে 'ছ' মনে করে অর্থের সম্ভাব্যতার দিকে দৃক্‌পাত না করেই নিজের পুথিতে 'ইছের' লিখেছেন। (২) শব্দবিভ্রান্তি : অনেক

সময় বহুপরিচিত শব্দের প্রভাবে লিপিকর স্বল্পপ্রচলিত বা প্রায়-অপরিচিত শব্দের রূপ পরিবর্তিত করেন। ফলে পাঠবিপর্যয় ও দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়; যেমন, ৩৬২৮ নং ক.বি. পুথির ২।খ-৩।ক পৃষ্ঠায় আছে 'বিরকালু লাউসেন আণ্ডিল পাথর'—'পাথর' শব্দটি নিজে নিরর্থক না হলেও এখানে অপ্রাসঙ্গিক, প্রাচীনতর পুথির (র. ভা. ১৫) সঙ্গে তুলনা করলে জানা যায় এখানকার প্রকৃত পাঠ 'বির কালু লাউসেন আণ্ডিল পাখর' [পাখর=দ্রুতগামী যুদ্ধঘোটক]। 'পাখর' শব্দটি ১৭শ শতকে প্রচলিত থাকলেও ক বি. পুথির লিপিকরের সমসাময়িক কালে (১৮২০) অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। তাই অর্থের যোগ্যতা বিচার না করেই লিপিকর মূল 'পাখর' শব্দের জায়গায় অপেক্ষাকৃত বহুপ্রচলিত 'পাথর' শব্দটি বসিয়েছেন। ফলে পাঠবিকৃতি ও অর্থবিভ্রাট। (৩) পাঠবিভ্রান্তি: লিপিকর যদি আদর্শপুথির অবিচ্ছিন্ন লিপিধারা ঠিকমতো বিশ্লেষ করতে না পারেন তবে তাঁর পাঠগ্রহণে বিপর্যয় ঘটে এবং তাঁর পুথি দেখে পরবর্তীকালে যত পুথি অনুলিখিত হয় সব পুথিতেই সেই পাঠবিভ্রান্তি সংক্রমিত হয়। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির ২০৮।ক পৃষ্ঠায় আছে 'তার দসনরসনে কাহ্নু চাপিল দশনে'—এখানে অর্থযোগ্যতা বিচার করে বসন্তরঞ্জন পাঠ নিয়েছেন 'দসনের সনে'। এই পাঠ সংগত, সম্ভবতঃ আদর্শ পুথিতে এই পাঠই ছিল, কিন্তু লিপিকর সম্ভবতঃ অবিচ্ছিন্নভাবে লেখা 'দসনেরসনে' অংশটি ঠিকমতো বিশ্লিষ্ট করতে না পেরে আদর্শ পাঠের এ-কার বাদ দিয়ে নিজের পুথিতে লিখেছেন 'দসনরসনে'।

বিপর্যয়ের অপর কারণ লিপিকরের অসতর্কতা। কোন কোন লিপিকর আদর্শ পুথির যথাযথ পাঠোদ্ধার করতে পারলেও অনেক সময় অসতর্ক অবস্থায় নিজের পুথিতে আদর্শ পাঠের বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলেছেন। এই বিপর্যয় নানাভাবে ঘটতে পারে: (১) বর্ণ, শব্দ বা চরণের স্থানবিপর্যয়। বর্ণের স্থানবিপর্যয়কে বলে বর্ণবিপর্যয় (Anagrammatism); যেমন: চর্যাপুথির ৬৩।ক পৃষ্ঠায় আছে 'জো তরু ছেব ভেবউ ন জাইণ', কিন্তু পরবর্তী পঙ্‌ক্তির অন্ত্যপদ 'মানই' দেখে বোঝা যায় এখানে লিপিকর 'জানই' লিখতে 'জাইন' লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির ১১৬।ক পৃষ্ঠার 'চেরু বেরু ফেরুস' আসলে হবে 'চেরু বেরু সফেরু'। শুধু বর্ণই নয়, শব্দেরও স্থানবিপর্যাস ঘটে, যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির ২৫।ক পৃষ্ঠায় আছে 'গিরি করিলোঁ মোথড়া গোবালী', কিন্তু পূর্ববর্তী

পঙ্‌ক্তির অন্ত্যপদ 'দড়া'-র অস্তিত্বে বোঝা যায় এখানে শব্দের স্থানবিপর্যয় হয়েছে, শুদ্ধ পাঠ হবে 'গোবালী মোথড়া'। চরণের স্থানবিপর্যয়ের উদাহরণ পাই ধর্মমঙ্গলের পূর্বোক্ত পুথিদ্বয়ে। প্রাচীনতর পুথি (র-ভা ১৫, ১৬০২ খ্রীঃ)-তে যেখানে আছে

জোড়া সিংহাসারে কালু সব্দ জায় দুর।
চমক পড়িল রাজ্য অজয় ঢেকুর।

অর্বাচীন পুথিতে (ক. বি. ৩৬৯৮, ১৮২০ খ্রীঃ) সেখানে আছে

[চমক পড়িল রা] য্য অজয় ঢেকুর।
জোড়া সিঙ্গা সারে কালু সব্দ জায় দুর॥

এখানে প্রাচীনতর পুথির পাঠই শুদ্ধ মনে হয়, কারণ জোড়া সিঙ্গার দূরগামী শব্দেই ঢেকুর রাজ্য চমকিত হল; অর্থাৎ আগে সিঙ্গা-বাদন, তারপর চমকিত হওয়া। সেদিক থেকে প্রাচীনতর পুথির পাঠই যুক্তিযুক্ত। অর্বাচীন পুথির পাঠান্তর আসলে চরণের অসতর্ক স্থানান্তর।

লিপিকরের অসতর্কতার আর একটি ফল সমীকরণজাত পদপরিবর্তন, অর্থাৎ দুটি ভিন্ন শব্দের জায়গায় একই শব্দের পুনরাবৃত্তি। এই ধরনের ভুল সাধারণতঃ চরণের শেষ পদের ক্ষেত্রেই ঘটে, যেমন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির ১২৭।খ পৃষ্ঠায় প্রথমে লেখা ছিল

সকল গোআলকুল লঁআ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল ততিখনে॥

পরে দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'ততিখনে' কেটে লিপিকর বা পাঠপরীক্ষক 'সেইখানে' করেছেন।

লিপিকর যদি শ্রুতিলেখক (amanuensis) হন, তবে লিপিকরের পক্ষে আর এক ধরনের অসতর্কতা দেখা যায়, অর্থাৎ কেউ যদি আদর্শ পুথি পাঠ করে যান আর লিপিকর সেই আদর্শপুথিপাঠকের ঔপভাষিক উচ্চারণ অনুসারে পদের বানান লিখে যান, তবে লিপিকরের হাতে মূল শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। যেমন, ডঃ সুকুমার সেন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক. বি. পুথি (১০৮৬ নং) পুথির বানানবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বলেছেন: 'মনে হয় যে লেখক পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন, নয় তিনি শ্রুতিলিখন করিয়াছিলেন এবং যিনি পড়িয়া যাইতেন তিনি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। যেমন, 'কুটি'—কোটি,

'শ্রোতি'=শ্রুতি; 'সুনিত'=শোণিত। শব্দে প্রত্যাশিত চন্দ্রবিন্দুর বর্জনেও এই অনুমান সমর্থিত হয়' (ভূমিকা, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদমি, পৃ.৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের পুথি (২৮৭৬ নং)খানিতেও এই রকম ঔপভাষিক বানানবিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়, এখানে লিপিকর সম্ভবতঃ শ্রীহট্টনিবাসী (দ্র. শ্রীকৃষ্ণবিজয় : খগেন্দ্রনাথ মিত্র-সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ ১৸/০)।

খ. বর্জন :

কখনো কখনো আদর্শ পুথির শব্দ, চরণ, স্তবক বা অংশবিশেষ অনুলিখিত পুথিতে বাদ পড়ে যায়। এই বাদ পড়ার পেছনে কখনো লিপিকরের অসতর্কতা, কখনো আলস্য, কখনো বা দায়সারা মনোভাব কাজ করে। আদর্শ-পুথির অংশবিশেষের এই বর্জনকে বলে ছাড় বা লিপিচ্যুতি (Lipography)। যেমন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্পাদককর্তৃক নির্বাচিত আদর্শ পুথিতে আছে :

মুখে জল দিয়া তারে তুলে সখিগন।
কোন কাজে কান্দ উসা কহত কথন॥ ২৯১ ॥
না কান্দ না কান্দ উসা স্থির কর মতি।
কি করিতে পারে এথা কাহার সকতি॥ ২৯১১ ॥
নাহি করে রাকার না স্থনে বচন।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করএ ক্রন্দন॥ ২৯১২ ॥

কিন্তু ঐ কাব্যের ক. বি. ৯১৮ সংখ্যক পুথিতে '২৯১১ সংখ্যক পদ ও পরের পদের প্রথম কলিটি' ছাড় পড়েছে। এই ছাড় পড়ার কারণ সম্ভবতঃ লিপিকরের অন্যমনস্কতা। ২৯১০ সংখ্যক পদের শেষ শব্দ 'কথন'-এর সঙ্গে ২৯১২ সংখ্যক পদের শেষ শব্দ 'ক্রন্দন'-এর অনায়াস অন্ত্যানুপ্রাস ঘটায় লিপিকরের মনোযোগের শৈথিল্য বিঘ্নিত হয় নি।

লিপিকরের অসতর্কতা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায় সমশব্দের বর্জনের ক্ষেত্রে। যদি একাধিক পঙ্‌ক্তির আদিতে বা শেষে একই শব্দ বা বাক্যাংশ থাকে তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকর একই শব্দ বা বাক্যাংশের প্রত্যাশিত পুনর্লিখন না করে সেটি একটিবার মাত্র লেখেন। এই ধরনের বর্জনকে বলা হয় সমাক্ষরলোপ (Haplography)। এই সমাক্ষরলোপ আবার দুরকম : (১) যদি লুপ্ত শব্দ বা বাক্যাংশ আদর্শ পাঠের পঙ্‌ক্তির গোড়ায় থাকে, তবে তাকে বলা যায় আদি সমাক্ষরলোপ, (২) যদি লুপ্ত শব্দ বা বাক্যাংশ আদর্শ পাঠের

পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে তবে তাকে বলা যায় অন্ত্যসমাক্ষরলোপ। যেমন, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের সম্পাদক-কর্তৃক গৃহীত আদর্শ পুথিতে আছে :

পাদ্যঅর্ঘ্য দিল তবে দির্ব্য সিংহাসন।
নানা অভরন দিয়া করিল ভূসন ॥ ৩১২৮ ॥
সম্ভ্রমেত গিয়া রাজা উসার মন্দিরে।
বন্দি ছোড়ান করি আনি অনিরুদ্র বিরে ॥ ৩১২৯ ॥
কৃষ্ণের স্থানে আনি তারে করিল সন্নিধান।
নানা রত্ন দিয়া কৈল উসা কন্যা দান ॥ ৩১৩০ ॥
হস্তি ঘোড়া রথ দিল জৌতুক করিয়া।
দাস দাসী গন দিল রতনে ভূসিয়া ॥ ৩১৩১ ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
নানা রত্নে অনিরুদ্রে করিল ভূসন ॥ ৩১৩২ ॥

কিন্তু ঐ কাব্যের ক. বি. ৯৫৮ সংখ্যক পুথিতে পূর্বোদ্ধৃত ৩১২৯—৩১৩২ সংখ্যক পদগুলি নেই। তার জায়গায় আছে :

পাদ্য অর্ঘ্য দিল তবে দির্ব্য সিংহাসন।
নানা রত্নে অনিরুদ্রে করিল ভূসন ॥

ক.বি. ৯৫৮ পুথির এই অংশে আদি ও অন্ত্য উভয় প্রকার সমাক্ষরলোপ ঘটেছে। আদর্শ পুথির ৩১২৮ ও ৩১৩২ সংখ্যক পদের গোড়ায় যে 'পাদ্য অর্ঘ্য দিল' বাক্যাংশটির পুনরাবৃত্তি আছে, ৯৫৮ সংখ্যক পুথিতে তা বর্জিত হয়ে একবার মাত্র অনুলিখিত হয়েছে। অন্যদিকে ৩১২৮ ও ৩১৩২ সংখ্যক পদের শেষে যে 'করিল ভূসন' পুনরাবৃত্ত হয়েছে, ৯৫৮ সংখ্যক পুথিতে সেই পুনরাবৃত্তি বর্জিত হয়েছে। ফলে ৯৫৮ সংখ্যক পুথিতে আদর্শপুথির ৩১২৮ সংখ্যক পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি ও ৩১৩২ সংখ্যক পদের শেষ পঙ্‌ক্তি মাত্র রক্ষিত হয়েছে, মধ্যবর্তী বাকী পঙ্‌ক্তিগুলি একেবারে বর্জিত হয়েছে। এই বর্জন ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দুই-ই হতে পারে।

গ. সংযোজন :

লিপিকরের অসর্তকতার জন্য একই বর্ণ, শব্দ, বাক্যাংশ বা চরণ অনাবশ্যক ভাবে পুনরাবৃত্ত হয়ে থাকে। যেমন, চর্যাপুথির ৬াক পৃষ্ঠায় 'এক সে

সুগুনিণী তুই ঘরে সান্ধঅ'—'সুগুনিণী'তে 'নি' অযথা সংযোজিত। ঐ পুথির ১৬।ক পৃষ্ঠায় 'নগর বারিহিরেঁ ডোম্বি'—এখানে শুদ্ধ পাঠ 'বাহিরেঁ' 'রি' অসতর্কভাবে সংযোজিত। শব্দ ও বাক্যাংশের অসতর্ক সংযোজনের উদাহরণ আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথিতে : ১৮৭।খ পৃষ্ঠায় 'এবে তাক বাঁশী দেহ বাঁশী আনী'—এখানে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় 'বাঁশী' অসতর্কভাবে সংযোজিত। ২০৫।খ পৃষ্ঠার ভণিতায় 'গাইল বড় চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ল'—এখানে 'গাইল…চণ্ডীদাস'-এর একাংশ লিপিকরের অসতর্কতায় পুনরাবৃত্ত। এই ধরনের অসতর্ক পুনরাবৃত্তির নাম লিপিদ্বিত্ব (Dittography)।

লিপিকর যে সব সময় অসতর্কভাবেই এক অংশের অবিকল পুনর্লিখন করেন তা নয়, কখনো কখনো আদর্শ পুথির মূল পাঠে নিজের ইচ্ছামত-ও নতুন কিছু অংশ সংযোজন করেন। অনেক সময় পুথির গায়েন কর্তৃক এই নতুন অংশ সংযোজিত হয়। এই সংযোজিত অংশকে বলে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। মূল পাঠের বিষয়বস্তুকে স্ফুটতর করার জন্যই সাধারণতঃ প্রক্ষিপ্তপাঠ সংযোজিত হয়। কিন্তু অনেক সময় প্রক্ষিপ্ত পাঠ অনুলিখিত পুথিতে অর্থগত অসংগতি সৃষ্টি করে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-পুথির ১১।ক পৃষ্ঠায় রাধার মুখে 'আহ্মার কোমল দেহে' শীর্ষক যে উক্তিমূলক গান আছে, সেটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন 'প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ মূল রচনায় ছিল না' বলে মন্তব্য করেছেন, কারণ 'ইহার মর্ম অনুনয়-সূচক। পূর্ববর্তী পদের এবং পরবর্তী রাধার উক্তির সহিত একেবারে মিল নাই। এই পদ পরবর্তী পদের—যাহাতে বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রত্যাখ্যানকে অন্যভাবে বিবৃত করিতেছে—ব্যাখ্যা রূপে রচিত' (বা-সা-ই, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ ১৪৮, পাদটীকা ৫)। প্রকৃতপক্ষে ডঃ সেনের এই অনুমান অযৌক্তিক নয়, কেননা এই গানের অব্যবহিত আগে ও পরে রাধার সংলাপে যে তীব্র কৃষ্ণবিরাগ ও অবিচল পতিনিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষ্ণের উদ্দেশে রাধার এই অনুনয় ও কাতরতা অসংলগ্ন মনে হয়। এখানে আর একটি জিনিস লক্ষণীয় : পুথিতে এই গানের পরে যে সংস্কৃত শ্লোকটি আছে, সেটি এই গানের আগে লিখে আবার কেটে দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধন যদি লিপিচ্যুতির সংশোধন না হয় তবে অনুমান করা যায় যে মূল রচনায় এই গানটি ছিল না। মূল রচনায় এই অংশের ক্রম হয়ত এই রকম ছিল : রাধা-বড়ায়ি সংলাপ + সংস্কৃত শ্লোক + বড়ায়ির গান, প্রাপ্ত পুথির পাঠের

ক্রম এই রকম : রাধা-বড়ায়ি সংলাপ+সংস্কৃত শ্লোক (কাটা)+রাধার গান+বড়ায়ির গান+পূর্বে কাটা সংস্কৃত শ্লোক। এই দুরকম ক্রমবিন্যাসের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে রাধার গানটি সংযোজিত করার জন্যই লিপিকরকে সংস্কৃত শ্লোকটি প্রথমবার লিখে আবার কেটে দিতে হয়েছে। রাধার গানের পৌর্বাপর্য বিচার করলে বোঝা যায় এই সংশোধন লিপিচ্যুতি-জনিত নয়, নতুন পাঠ-সংযোজনের জন্য। বলা বাহুল্য, এই নতুন পাঠ 'প্রক্ষিপ্ত' হওয়াই সম্ভব।

ঘ. মিশ্রণ :

অনেক সময় লিপিকরের সামনে একাধিক পাঠসম্বলিত অনেকগুলি আদর্শ পুথি থাকলে তিনি বিভিন্ন পুথির বিভিন্ন পাঠ ইচ্ছামত গ্রহণ-বর্জন-পরিবর্তন করে একটি মিশ্র পাঠ গ্রহণ করতেন। এই মিশ্র পাঠগ্রহণ করার পেছনে কোন যুক্তি বা সচেতন বিচারবুদ্ধি কাজ করত না। পাঠনির্বাচনের পেছনে তাঁর স্বেচ্ছাচারই প্রধান মানদণ্ড ছিল। এইজন্য এই পাঠ প্রায়ই বিকৃত এবং মূল থেকে অনেক দূরবর্তী। এই ধরনের পাঠকে বলে মিশ্র পাঠ (conflated reading)।

এই মিশ্র পাঠ থেকে মূল পাঠ নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিভিন্ন পুথি এই রকম মিশ্র পাঠের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৭. পাঠসমালোচনা

কবির কবিত্বশক্তি বিচারের সর্বপ্রধান অবলম্বন তাঁর কাব্য। কিন্তু সমালোচক যদি কবির কাব্যের বিশ্বস্ত অনুলিপি না পান তবে তাঁর সমালোচনাও যথার্থ হয় না। এ যুগে ছাপাখানার দৌলতে কবিদের কাব্যগ্রন্থের বিশ্বস্ত অনুলিপি পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু মধ্যযুগের কবিদের কাব্যগ্রন্থের বিশ্বস্ত অনুলিপি খুবই দুর্লভ। অধিকাংশ পুথিই 'অরক্ষিত', পাঠবিকৃতির ফলে পুথির পাঠ কবির নিজের পাঠ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এক্ষেত্রে কবির কবিত্ব নিরূপণ করার আগে প্রয়োজন কবির নিজের পাঠ অর্থাৎ কবি নিজে যা লিখেছিলেন বা লিখতে পারেন তা নিরূপণ করা। এ কাজে নানা ধরনের বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই বিচারপদ্ধতিকে ইংরেজিতে বলে textual criticism, বাংলায় বলা যেতে পারে 'পাঠ-সমালোচনা'।

পাঠসমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে মূল পাঠ বা তার কাছাকাছি বিশুদ্ধ পাঠ নির্ধারণ করা। এই উদ্দেশ্যে পাঠসমালোচক প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন: (ক) পাঠসংশোধন (emendation), (খ) পাঠ-পুনর্গঠন (recension)।

(ক) পাঠসংশোধন: পাঠসংশোধনের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাপ্ত পাঠসমূহের মধ্যে যেসব বিকৃতিজনক উপাদান আছে সেগুলো দূর করা। একাজে পাঠ-সমালোচক এই সব ব্যবস্থা নিতে পারেন: (১) প্রাপ্ত পাঠগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পাঠগুলি উদ্ধার করা। সাধারণতঃ পুথিগুলির পুষ্পিকায় বর্ণিত লিপিকাল থেকেই পাঠের প্রাচীনতা নির্ধারণ করা যায়; লিপিকাল না পেলে পুথির অবস্থা, উপকরণ, লিপির ছাঁদ, ভাষাবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি থেকেও পাঠের প্রাচীনতা নির্ধারণ করা চলে। তবে পাঠ প্রাচীন হলেই যে তা মূল বা বিশুদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। কাজেই পাঠবিচারের প্রাথমিক স্তরে বিশুদ্ধ পাঠের সন্ধান না করে বিবিধ প্রাচীনতর পাঠ উদ্ধার করাই হবে পাঠসমালোচকের কাজ। (২) প্রাচীনতর পাঠগুলি উদ্ধার করার পর সমালোচক ঐ সব পাঠের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক অভেদ ও প্রভেদের প্রকার ও পরিমাণ নিরূপণ করবেন। (৩) তারপর এই পাঠপ্রভেদের পেছনে লিপিকরের দায়িত্ব কতখানি তা নিরূপণ করে লিপিকর-প্রমাদগুলি সংশোধন করতে হবে। এ ব্যাপারে পুথির পুষ্পিকা অর্থাৎ পুথিতে যে অংশটি লিপিকরের নিজস্ব রচনা সেই অংশ বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারে। পুষ্পিকা থেকে লিপিকরের স্থান-কাল-প্রবণতা-রচনাভঙ্গী ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায় সেই সব তথ্য দিয়ে পাঠবিকৃতি ও পাঠপ্রভেদের সম্ভাব্য প্রকার নির্ণয় করা যেতে পারে। যেমন, পঞ্চদশ শতকে রচিত কোন কাব্যের অষ্টাদশ শতকীয় পুথিতে যদি কোন পর্তুগীজ বা ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, তবে স্পষ্টই ধরে নেওয়া যায় যে শব্দটি কবির ব্যবহৃত নয়, অষ্টাদশ শতকের লিপিকরের ব্যবহৃত, কারণ পঞ্চদশ শতকের বাংলা শব্দভাণ্ডারে পর্তুগীজ বা ইংরেজি শব্দ গৃহীত হয় নি। সেক্ষেত্রে পাঠটি বর্জনীয়। এইভাবে লিপিকর-কর্তৃক কৃত সম্ভাব্য বিকৃতিগুলি অনুমান করতে পারলে সেগুলি বর্জন করে যে সব পাঠ পাওয়া যায় সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ পাঠ বলে সাময়িকভাবে ধরে নেওয়া যায়।

(খ) পাঠ-পুনর্গঠন: পুথি থেকে সম্ভাব্য লিপিকর-প্রমাদগুলি বাদ

দিলে যেসব পাঠ (presumptive variants) পাওয়া যায়, সেগুলির শুদ্ধতর হবার সম্ভাবনা প্রবল হলেও তাতে পাঠসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। কারণ এক্ষেত্রেও পাঠের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। অথচ কবির নিজের পাঠ তো একটাই এবং পাঠসমালোচনার লক্ষ্যও সেই একক পাঠটি উদ্ধার করা। কাজেই পাঠসংশোধন করলেই পাঠসমালোচকের কাজ শেষ হয় না, তাঁকে তাঁর কর্তব্য শেষ করতে হলে ঈপ্সিত পাঠের সম্ভাব্য পুনর্গঠনও করতে হবে। এ কাজে তিনি দুভাবে অগ্রসর হতে পারেন : ( ) বাহ্য প্রমাণাদির (testimonium) সাক্ষ্য গ্রহণ, (২) প্রাপ্ত পাঠগুলির অভ্যন্তরীণ বিচার-বিশ্লেষণ।

অনেক সময় আলোচ্যমান গ্রন্থের রচনাংশ ভিন্নতর প্রাচীন রচনায়, যথা, (ক) কাব্যসংকলনে, (খ) অপর কবির রচনায়, (গ) ব্যাকরণ-অলংকার বা শাস্ত্রগ্রন্থের দৃষ্টান্তে উদ্ধৃত থাকে। এই সব উদ্ধৃতির সঙ্গে মিলিয়ে আলোচ্যমান গ্রন্থের পাঠপুনর্গঠন করা যেতে পারে। যেমন, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন বৈষ্ণব পদসংকলনে পূর্ববর্তী যুগের অনেক কবির পদ সংকলিত হয়েছে, ঐ সব কবির পদের নতুন পুথি পেলে এইসব সংকলনের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন পুথির বিকৃত পাঠ সংশোধন ও পুনর্গঠন করা চলে। এ ছাড়া, আলোচ্যমান গ্রন্থ অন্য কোন গ্রন্থের অনুবাদ হলে, কিংবা আলোচ্যমান গ্রন্থের কোন অনুবাদ থাকলে, যথাক্রমে মূল ও অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচ্যমান পাঠের পুনর্গঠন করা যেতে পারে। যেমন, ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের দুটি পুথিতে ৩২৪ সংখ্যক পদের দুটি পাঠ পাওয়া যায় :

১. দৈবকী অষ্টম গর্ভে কভু কন্যা নহে।
মায়া পাতিয়া সেই গোকুলে আছএ ॥
২. দৈবকী অষ্টম গর্ভে কন্যাকে ভুলায়ে।
মায়া পাতিয়া সেই গোকুলে নিলয়ে ॥

মূল ভাগবতে আছে :

দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতি ১০।৮।৮

মূলের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় প্রথম পাঠটিই সংগত এবং সেই কারণেই বিশুদ্ধ। অন্যদিকে, চর্যাপুথির ৩৭।খ পৃষ্ঠায় ৪০ নং চর্যার একটি পঙ্‌ক্তির পাঠে আছে ‘কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা’—এই পাঠ সংশয়িত মনে হয়, কারণ কালা বা বধিরের পক্ষে ‘সংবোধন’ বা কথা বলার কোন অসুবিধা নেই,

সে অসুবিধা বোবার পক্ষেই ; কাজেই সন্দেহ হয় পাঠটি মূলে 'কাল বোবেঁ' বা 'বোবেঁ কাল' ছিল কিনা। প্রকৃতপক্ষে এই চর্যার এই অংশের তিব্বতী অনুবাদে আছে 'klug pas lon par' = বোবার দ্বারা কানা = বোবেঁ কান = বোবেঁ কাল (তিব্বতী অনুবাদক যে পুথি থেকে অনুবাদ করেছিলেন সেই পুথিতে 'বোবেঁ কাল' পাঠই ছিল, কিন্তু 'ল্' ও 'ন'-এর ছাঁদ প্রায় একরকম হওয়ায় অনুবাদক 'কাল'কে 'কান' পড়ে 'কানা' অর্থ করেছেন, কারণ 'কানা'র পক্ষে দেখার অসুবিধা থাকলেও শোনার অসুবিধা নেই। এখানে পূর্বপ্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় সমস্যাটি বোবা-কালার উক্তি ও শ্রুতির পারস্পরিক বিভ্রাট নিয়ে)। কাজেই তিব্বতী অনুবাদ থেকে বোঝা গেল এই অংশের 'বোবেঁ কাল' পাঠও প্রচলিত ছিল এবং সেই পাঠই সংগত ও শুদ্ধ। এইভাবে এই অংশের পাঠ পুনর্গঠন করে পাঠ নেওয়া যেতে পারে 'বোবেঁ কাল সংবোহিঅ জইসা'। এছাড়া, আলোচ্য গ্রন্থের কোন টীকা-বৃত্তি থাকলে সেই টীকা-বৃত্তির পাঠ ধরেও আলোচ্য গ্রন্থের সংশয়িত পাঠের পুনর্গঠন করা চলে ; যেমন, চর্যাপুথির ৫২াক পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ৪০ সংখ্যক চর্যার একটি পঙ্ক্তির পাঠ আছে : 'পারি (খি ?) ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাদে'— অর্থগত অসংগতি ও দুর্বোধ্যতার জন্য এই পাঠের শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। পুথিতে (পৃ ৫৩াক) এই অংশের টীকায় আছে : 'যে যে পুস্তকদৃষ্টিগতাঃ পণ্ডিতাচার্যাঃ। তে তে মম পাশসন্নিধানান্তরমপি ন পশ্যন্তি'—এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পাশসন্নি-ধানান্তরম্ = 'পাশি', ন পশ্যন্তি = 'ন চাহই' বা 'ন চাহঅ', পণ্ডিতাচার্যাঃ = 'পাণ্ডিআচাএ' অর্থাৎ টীকাকার-ব্যবহৃত পুথিতে পাঠ ছিল 'পাশি ণ চাহঅ মোরি পাণ্ডিআচাএ'। এই পাঠই শুদ্ধ ও সংগত, তবে লিপিকরের অসতর্কতার জন্য পুথিতে ঐসব পাঠবিকৃতি ঘটেছে। তিব্বতী অনুবাদেও এই অনুমিত পাঠের সমর্থন আছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে অনুমিত পাঠটিকেই গ্রহণ করে পুথির বিকৃত পাঠের পুনর্গঠন করা যেতে পারে।

যেখানে বাহ্য প্রমাণাদির অভাব, কিংবা বাহ্য প্রমাণাদি থেকেও সন্তোষজনক পাঠপুনর্গঠন সম্ভব হচ্ছে না অথবা যেখানে মাত্র একটি পুথিই অবলম্বন সেখানে পাঠপুনর্গঠনের জন্য প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য পাঠের প্রাসঙ্গিকতা, অর্থবোধ্যতা ও ভাষা-ছন্দ-রচনাভঙ্গীর অন্তঃসংগতির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন, চর্যাপুথির ৬াখ পৃষ্ঠায় একটি পাঠ আছে :

চউশঠী ঘড়িয়ে দেঢ় পসারা।
পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা ॥

বিভিন্ন চর্যাবিশেষজ্ঞ এই পাঠটিতে নানারকম বিকৃতি অনুমান করেছেন, যেমন, 'দেঢ়' = দেল (বাগচী), দেউ (শহীদুল্লাহ), দেট (শাস্ত্রী ও সেন)। এবং 'গরাহকা' = গরাহক, আ-কার অহেতুক। কিন্তু এই পাঠসংশোধনের আগে দেখা দরকার প্রাপ্ত পাঠে অর্থোদ্ধার হয় কি না। প্রাপ্ত পাঠে অর্থোদ্ধার না হলে অবশ্যই পাঠসংশোধনের কথা ভাবতে হবে, তবে তারও আগে দরকার পাঠপরীক্ষা। পরীক্ষা করে দেখা গেল 'প্রচুর' অর্থে 'দেঢ়' বা 'ডেড়' শব্দটি মুকুন্দরামসহ মধ্যযুগের অন্য কবিরা অনেকবার ব্যবহার করেছেন। কাজেই 'চউশঠী ঘড়িয়ে দেঢ় পসারা' = চৌষট্টি ঘড়ায় প্রচুর পসরা। গরাহকা = গ্রাহকের [গ্রাহক > গরাহক (অর্ধ তৎসম) + -আ (-অস্য > -অস্স > -আস > -আহ > -আ) = গরাহকা]। কাজেই এখানেও পাঠশুদ্ধি বা পাঠপুনর্গঠনের প্রশ্ন নেই। কিন্তু যেখানে প্রাপ্ত পাঠ থেকে কোন অর্থবোধ হচ্ছে না সেখানে পাঠপুনর্গঠন অপরিহার্য, যেমন, চর্যাপুথির ১।খ পৃষ্ঠায় ১নং চর্যার শেষ পঙ্‌ক্তিতে পাঠ আছে 'ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইণ'—এখানে 'বইণ' পদটি দুর্বোধ্য, এবং 'বইণ' পদটির সঙ্গে পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির 'দিঠা' ক্রিয়াপদটির ধ্বনিসাম্য নেই, অথচ পদ্যের নিয়মানুসারে দুয়ের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস একান্ত প্রত্যাশিত। এদিক থেকে 'বইণ'-র জায়গায় সম্ভাব্য শুদ্ধ পাঠ 'বইঠা'। এতে অর্থও পরিষ্কার হয়, ছন্দও ঠিক থাকে। কাজেই পুনর্গঠিত পাঠ হবে 'বইঠা'। আর একটি উদাহরণ: চর্যাপুথির ৪৮।ক পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ৩৩সংখ্যক গানের রচয়িতার নাম কী? ঢেণ্ঢণপাদ না টেণ্টনপাদ? পুথিতে ট ও ঢ-এর ছাঁদ প্রায় এক রকম বলে অনেক বিশেষজ্ঞ একে 'ঢেণ্ঢণ পাদ' পড়েছেন, কিন্তু 'ঢেণ্ঢণ পাদ' তো অর্থহীন। তিব্বতী অনুবাদে যে নামটি পাওয়া যায় সেই 'ধেতন'-ও অর্থহীন। কাজেই পাঠটি অন্যবিধ হওয়াই সম্ভব। দেশীনামমালা(৪।৩)য় 'টেংটা' শব্দের অর্থ 'জুয়ার আড্ডা', সেই থেকে 'টেংটন' = জুয়াড়ি। এর পর অর্থসংক্রমের ফলে 'টেংটন' / 'টেণ্টন' = চতুর, ধূর্ত বা চালাক। জুয়াড়ি ও ধূর্ত অর্থে 'টেটন' শব্দটি মধ্য বাংলাতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৭] আধুনিক কথ্য বাংলাতেও 'চালাক' অর্থে 'টেঁটন' বা 'ট্যাঁটন' কথাটি প্রচলিত আছে। আলোচ্য চর্যাটিও অর্থের দিক থেকে বিশেষ চাতুর্যপূর্ণ। নিজের এই চাতুর্যকুশলতার জন্য

হয়ত কবি 'টেণ্টনপাদ' নাম পরিগ্রহ করেছেন। হয়ত এটি তাঁর স্বনাম নয়, ছদ্মনাম। কাজেই এক্ষেত্রে শুদ্ধ পাঠ হবে 'টেণ্টণপাদ'।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ বিচারবিশ্লেষণের জন্য পাঠসমালোচককে আলোচ্য যুগের ভাষা, ছন্দ ও সাহিত্যভঙ্গী সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হবে, নতুবা শুদ্ধ পাঠকেও অশুদ্ধ মনে হবার আশংকা দেখা দিতে পারে অথবা অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধ করতে গিয়ে নূতনতর অশুদ্ধি দেখা দিতে পারে। কাজেই মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের তিনিই যোগ্যতম পাঠক, যিনি একাধারে নিপুণ পাঠ-সমালোচক ও সহৃদয় রসগ্রাহী॥

প্রাসঙ্গিক টীকা

১। চণ্ডীমঙ্গল, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ২।

১ক. বিশ্বভারতী পুথিশালায় রক্ষিত ৯৭১ সংখ্যক পুথিতে মধ্যযুগের কালি তৈরির একটি ফর্মুলা ছড়ার আকারে লিখিত আছে:

কাজল গোমূত্র লায়ের জল
ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল
পীত কাষ্ঠ দিয়ে বসি
তোটে পত্র না তোটে মসি॥

(পুথিপরিচয়, ২য় খণ্ড)।

২। মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ডঃ আহমদ শরীফ, পৃ. ৭৭-৮৭

৩। শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ (বা সিদ্ধি) সহ যুগ পক্ষে যোগ তার সনে॥
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহ্ন [হি] ত।
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সঙ্গে হইল গীত॥ মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল।

'মহীপুত্রে'র অপর প্রতিশব্দ হিসাবে মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বর্ধমান সাহিত্যসভায় রক্ষিত পুথির পুষ্পিকায় 'ভূম্যাত্মক দিনবারে [লিখিতা] পুস্তিকাময়া'] উল্লিখিত হয়েছে (দ্রঃ বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত ধর্মমঙ্গল, পৃ. ৬০৬)।

৪। জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলগ্রহকে অঙ্গারবর্ণ অর্থাৎ লাল রঙের বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এজন্য মঙ্গলের অপর নাম অঙ্গারক।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৯৩৯।

৬। পাণ্ডুলিপিপাঠ ও পাঠসমালোচনা, পৃ. ১৫।

৭। দ্রষ্টব্য মৎপ্রণীত 'চর্যাগীতিপরিক্রমা' (২য় সংস্করণ), ৩৩নং চর্যার 'পাঠবিচার ও শাব্দিক টীকা'।

মধ্যযুগের কাব্যসঙ্গীত ঃ রূপ ও রীতি

নানা শাস্ত্র জানয়ে সঙ্গীত যে না জানে।
তাবে সে দ্বিপাদ মৃগ কহে বিজ্ঞ জনে॥
গীতচন্দ্রোদয় ঃ নরহরি চক্রবর্তী।

১. যুগান্তরের স্বরলিপি ঃ

বাংলা কাব্যের মধ্যযুগ ও নব্য যুগের মধ্যে ভেদরেখা অঙ্কনের জন্য যে বিভাজন-সূত্র সচরাচর অবলম্বিত হয় তা মূলতঃ দুই যুগের কাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে। এই সূত্র অনুসারে মধ্যযুগের কাব্য ধর্মনির্ভর, আর নব্যযুগের কাব্য মানব-নির্ভর। এই বিভাজন ইতিহাসসম্মত হলেও পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ এতে দুই যুগের কেবল বিষয়গত স্বরূপই প্রতিফলিত হয়, রূপগত দিকটি উপস্থাপিত হয় না। কিন্তু দুই যুগের সাহিত্যের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় প্রভেদ তা হলো সাহিত্য-বিষয়ের প্রচারগত (communicational) প্রভেদ। ইতিহাসের দিক থেকে এই প্রভেদ বিষয়গত প্রভেদের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মধ্যযুগেও সাহিত্যের শাখায় শাখায় বিষয়ভেদ ছিল এবং নব্যযুগেও বারে বারে বিষয়ভেদ ঘটেছে ও ঘটছে। কিন্তু মধ্যযুগের সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য থাকলেও প্রচারের রীতি ছিল গোটা যুগ ধরে এক এবং অভিন্ন, সেই রীতিতে যখন ছেদ পড়ল তখনই সাহিত্যে নব্যতার লক্ষণ ফুটে উঠল। মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রচার-রীতি ছিল সুরাশ্রিত। গান-আখ্যান-তত্ত্বালোচনা-নির্বিশেষে সব কিছুই সুরসহযোগে প্রচারিত হত, কাজেই ঐ সাহিত্য মূলতঃ ছিল শ্রব্য, পক্ষান্তরে উনিশ শতকে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাহিত্যের সব কিছুই হয়ে দাঁড়াল দৃশ্য অর্থাৎ চোখে দেখে পড়ার উপযোগী। এর ফলে সাহিত্যের প্রচারপদ্ধতিতে যে প্রভেদ দেখা দিল, তা এই রকম :

ক. মধ্যযুগ : সাহিত্য→সুর→রসভোক্তা।

খ. নব্যযুগ : সাহিত্য→রসভোক্তা।

অর্থাৎ নব্যযুগের সাহিত্যের প্রচারপদ্ধতিতে সুরের মধ্যস্থতা বর্জিত হলো। নব্যযুগের সাহিত্য যত বিষয়ভেদই ঘটুক না কেন তার এই যন্ত্রনির্ভর দৃশ্যধর্মিতার

জন্য তার সুরনিরপেক্ষতা সর্বত্র অব্যাহত। অন্যদিকে মধ্যযুগের সাহিত্যে যত বিষয়বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন তার প্রচারপদ্ধতির শ্রুতিনির্ভরতার জন্য তা সর্বত্রই সুরসাপেক্ষ। কাজেই মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে হলে তার এই সুরসাপেক্ষ গেয় ধর্মেরও বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার।

মধ্যযুগের সাহিত্যের এই সুরসাপেক্ষতার কারণ এই সাহিত্য ছিল বিশেষভাবেই অনুষ্ঠাননির্ভর। সেযুগের মানুষ দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজকর্মে এ যুগের মতই সাদামাঠা কথ্য ভাষাভঙ্গী ব্যবহার করত, কিন্তু যে কাজ ছিল সাধন-ভজন-পূজা-পার্বণের মত নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত, সে কাজ আনুষ্ঠানিক বলেই তাতে নানা আনুষ্ঠানিক 'ফর্ম' বা রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করতে হত। সে যুগে অনুষ্ঠানের প্রধান অনুষঙ্গী ছিল নৃত্য, গীত ও বাদ্য অর্থাৎ 'সঙ্গীত'। অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গী হিসাবে 'সঙ্গীত' অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রধানতঃ দুটি প্রয়োজন সিদ্ধ করত: ১. নৃত্যের তাল, গীতের সুর ও বাদ্যের বোল একত্রে মিলে অনুষ্ঠানকে লোকোত্তর করে তুলত, অর্থাৎ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দৈনন্দিন লৌকিক ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ত; ২. সঙ্গীতের নির্দিষ্ট ফর্ম অনুষ্ঠাতাকে বা অনুষ্ঠাতাদের অনুষ্ঠান-উদ্‌যাপনে সহায়তা করত, অর্থাৎ সঙ্গীত একটা নির্দিষ্ট 'ফর্ম' বা 'ফ্রেম' হিসাবে কাজ করায় ঐ ফর্ম বা ফ্রেম অবলম্বন করলেই অনুষ্ঠান-উদ্‌যাপন করা হয়ে যেত, অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপন-প্রণালী নিয়ে অনুষ্ঠাতাকে আলাদা করে চিন্তা করতে হত না। মধ্যযুগে সাহিত্য হিসাবে যা কিছু লেখা হয়েছে তা নিছক পাঠ্য হিসাবে লিখিত হয় নি, লিখিত হয়েছে এই আনুষ্ঠানিক 'ফ্রেম' বা 'ফর্মে'র প্রয়োজনে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সে যুগের কাব্য নিছক বাক্‌শিল্প নয়, নৃত্য-গীতের বাঙ্‌ময় আধার। এইজন্য মধ্যযুগের কাব্যরূপের কাঠামো বিশ্লেষণ করতে হলে ঐ কাব্যের সংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠানিক তথা সাঙ্গীতিক পটভূমিকাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

২. পদসংগীত: কীর্তন ও তার পর

মধ্যযুগের বিভিন্ন বাংলা কাব্যের শিরোভাগে উল্লিখিত বিভিন্ন রাগ ও তালের উল্লেখ থেকে সেকালের সঙ্গীতচর্চার কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও

এ বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাঙালী বৈষ্ণব সঙ্গীতশাস্ত্রী শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়' বইখানি উল্লেখযোগ্য। কারণ মধ্যযুগের বাংলাদেশে যাঁরা ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গীর সঙ্গীতচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করতেন তাঁদের গীত-রচনাপদ্ধতির একটা অনতিবিস্তর পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়। নরহরি তাঁর অপর বাংলা বই 'ভক্তিরত্নাকরে'র পঞ্চম তরঙ্গেও এ বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনার অবতারণা করেছেন, তবে এখানকার আলোচনা আর একটু বিশদ ও যথাযথ। নরহরি প্রাচীনতর সংগীতশাস্ত্রাদির অনুসরণে গানের যে প্রকারবৈচিত্র্য নির্দেশ করেছেন তা ছকের সাহায্যে এই ভাবে দেখানো যেতে পারে :
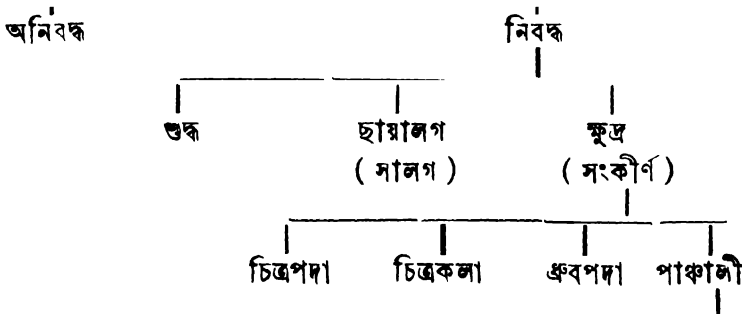
বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীবিভাগে নরহরির নিজস্বতা কিছু নেই। তিনি বিভিন্ন প্রাচীনতর সঙ্গীতশাস্ত্রীর মতামত অনুসরণ করেই বাংলায় শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিচয় উদ্ধার করেছেন। তবে তাঁর আলোচনায় মৌলিকতা না থাকলেও বিভিন্ন গীতের বিভিন্ন 'ধাতু' ও 'অঙ্গের' সংযোগ-বিয়োগের ফলে গীতপদ্ধতি ও গীতপদের রূপে কী রকম বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে তা তিনি স্বরচিত ও পররচিত বৈষ্ণব পদাবলীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত দৃষ্টান্তে দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন বাঙালী কবির সংস্কৃত ও ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদ গৃহীত হয়েছে। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় গানের ধাতু ও অঙ্গের বিশেষ বিশেষ সম্মেলনকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে পদসংগীত তথা বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যিক রূপকল্পটি কীভাবে গড়ে উঠেছিল।

ভারতীয় সংগীত শাস্ত্রানুসারে যে গীতের বাক্যরূপ নেই, যাতে শুধু রাগের আলাপ বা বিস্তার তার নাম অনিবদ্ধ গীত, আর যে গীত ধাতু ও অঙ্গসহ বাক্যে নিবদ্ধ তা নিবদ্ধ গীত। সংগীতশাস্ত্রের -পরিভাষায় যা নিবদ্ধ গীত সাধারণ ভাবে তা-ই কাব্যসংগীত বা গান।

এই গান সাধারণতঃ চারটি ধাতু বা অবয়ব নিয়ে গড়ে ওঠে: (১) উদ্‌গ্রাহ, (২) মেলাপক, (৩) ধ্রুব, (৪) আভোগ। কেউ কেউ ধ্রুব ও আভোগের 'অন্তরে' বা মাঝে আর একটি ধাতু যোগ করেন, সেটি 'অন্তরা'। 'অন্তরা'-কে নিয়ে গানের ধাতু-সংখ্যা পাঁচ। অন্যদিকে গানের ছয়টি অঙ্গ: (১) স্বর—স রি গ ম ইত্যাদি আলাপ, (২) বিরুদ—প্রশংসা বা গুণবাচক, (৩) পদ—যা অর্থ প্রকাশ করে, অর্থাৎ গানের গোটা বাণীই হচ্ছে পদ, (৪) তেন—মঙ্গলবাচক শব্দ, ওঁ হরি ওঁ ইত্যাদি আলাপ, (৫) পাট—কাব্যের সঙ্গে মুখে বাদ্যের বোল উচ্চারণ, যেমন, ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝাঙ্কণ ক্লণ তক থোঙ্গ থোঙ্গ তক থই থই থই থই, (৬) তাল—পরিমিত সময়ে যতি বা বিরাম। গানের পাঁচ বা চার ধাতু এবং ছয় অঙ্গ হলেও সব গানেই ধাতু ও অঙ্গ সংখ্যা একরকম থাকে না। গানে ধাতু ও অঙ্গ সংখ্যার কম-বেশী হতে পারে এবং এই তারতম্য অনুসারে গানেরও প্রকারভেদ ঘটে। সাধারণভাবে চার (মতান্তরে পাঁচ) ধাতু ও ছয় অঙ্গের মিলনে যে গান তার নাম 'প্রবন্ধ'। 'প্রবন্ধ'-গানের চরণসংখ্যা অন্ততঃ (৪ × ২ =)৮ বা (৫ × ২ =) ১০। প্রবন্ধ গানের পদক্রম এই রকম: উদ্‌গ্রাহ + মেলাপক + ধ্রুব + আভোগ, অথবা উদ্‌গ্রাহ + ধ্রুব + অন্তরা + আভোগ (এখানে মেলাপক বর্জিত), পাঁচটি ধাতু থাকলে: উদ্‌গ্রাহ + মেলাপক + ধ্রুব + অন্তরা + আভোগ। অন্যদিকে, গানে ব্যবহৃত অঙ্গসংখ্যা অনুসারেও গানের শ্রেণীভেদ করা হয়। অঙ্গসংখ্যা অনুসারে গান পাঁচ রকম: (১) মেদিনী—ছয় অঙ্গযুক্ত, (২) নন্দিনী—বিরুদ বাদে অপর পাঁচ অঙ্গ যুক্ত, (৩) দীপনী—স্বর, পদ, তেন, তালযুক্ত, (৪) পাবনী—স্বর, পদ, তালযুক্ত, (৫) তারাবলী—পদ ও তালযুক্ত। সঙ্গীতশাস্ত্রে আমরা গানের ছটি অঙ্গ পেলেও গানের সাহিত্যরূপে (text) সাধারণতঃ দুটি অঙ্গ মাত্র পাই—পদ ও তাল অর্থাৎ তালবদ্ধ তথা ছন্দোবদ্ধ পদ, বাকী চারটি অঙ্গ গায়ক গাইবার সময় প্রয়োজনমতো সংযোগ করেন। কাজেই সাহিত্যে প্রাপ্ত সমস্ত পদাবলীই এক হিসাবে দ্বি-অঙ্গ-বিশিষ্ট 'তারাবলী' জাতির গান।

নরহরিও তাঁর আলোচনায় এই রকম একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'ঐছে অঙ্গভেদে কবি করহ বর্ণন। শুদ্ধ গীত মধ্যে এ সকল নিরূপণ॥' অর্থাৎ এই রকম অঙ্গভেদ শুদ্ধ গীত অর্থাৎ আলাপ-ধাতু-অঙ্গযুক্ত গানেই নিরূপণ করা সম্ভব। শুধু শুদ্ধ গীত নয়, ছায়ালগ গীতেও এই নিরূপণ সম্ভব, কারণ 'শুদ্ধ গীত প্রায় ছায়ালগ সে শাস্ত্রেতে'। শুদ্ধ ও ছায়ালগ বাদ দিলে বাকী থাকে 'ক্ষুদ্র গীত', ক্ষুদ্র গীতের বর্ণনায় তিনি বলেছেন: 'তালধাতুযুক্ত বাক্যমাত্র ক্ষুদ্রগীত', অর্থাৎ তারাবলীর দুই অঙ্গ—তাল ও পদ অর্থাৎ 'ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্র'। কাজেই সাহিত্যে প্রাপ্ত সমস্ত গীতই পারিভাষিক অর্থে 'ক্ষুদ্র'গীত এবং সেই গীত হচ্ছে 'তারাবলী' জাতীয় অর্থাৎ দুই অঙ্গযুক্ত। আর একটি ব্যাপারেও অন্য দুই শ্রেণীর গীতের সঙ্গে ক্ষুদ্র গীতের স্বাতন্ত্র্য আছে: 'ক্ষুদ্র গীতে অন্ত্য অনুপ্রাস সুনিশ্চয়। দেখহ শাস্ত্রজ্ঞগণ বিবরিয়া কয়' অর্থাৎ অন্য দুই গীতে অন্ত্যানুপ্রাস আবশ্যিক নয়, কিন্তু ক্ষুদ্র গীতে আবশ্যিক। এই ক্ষুদ্রগীত চতুর্বিধ: (১) চিত্রপদা, (২) চিত্রকলা, (৩) ধ্রুবপদা, (৪) পাঞ্চালী।

'চিত্রপদা'র লক্ষণ নির্ণয় করে নরহরি লিখেছেন:

কেবল পদবৈচিত্র্যে চিত্রপদা হয়। ইথে ধাতুবৈচিত্র্যাদি নহে এ নিশ্চয়॥
অকঠোর-অনুপ্রাস-প্রসাদাদি গুণ। যুক্তপদবৈচিত্র্যার্থ জানো পুনঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ যে ক্ষুদ্রগীতে ধাতুর বৈচিত্র্য নেই, পদের বৈচিত্র্য আছে, তাকে বলে চিত্রপদা। পদের বৈচিত্র্য বলতে এখানে অকঠোর অনুপ্রাস ও প্রসাদাদিগুণকে বোঝাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি গোবিন্দদাসের একটি গান উদ্ধৃত করেছেন:

কুন্দল কনক কলিত করকঙ্কণ কালিন্দীকূলবিহারী।
কুঞ্চিত কচ কেশর কুসুমাকুল কামিনী করধারী॥ [উদ্গ্রাহ]
জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জিতি সু জ্যোতি যছু মোহিত যুবতীযূথ অথির॥ ধ্রু॥
পদুমিনী-পাণি পরশে পুলকায়িত পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চল পদপঙ্কজ পরচারি॥ [অন্তরা]
রমণীরমণ রতন রুচিরানন রঞ্জিত রতিরসবাস।
রসনারোচন রসিক রসায়ন রচয়তি গোবিন্দদাস॥ [আভোগ]

এখানে ধাতুর সংখ্যা চার অর্থাৎ প্রবন্ধ গানে যে কয়টি ধাতু থাকা দরকার গতানুগতিকভাবে সেই কয়টিই আছে, কাজেই ধাতুর দিক থেকে পদটি বৈচিত্র্যহীন, পদটির বৈচিত্র্য সরল অনুপ্রাসের সাবলীলতায়।

চিত্রকলার লক্ষণ :

উদ্‌গ্রাহ আভোগে মাত্রা সম নিরূপয়। ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন হইলে চিত্রকলা কয় ॥
ইহাতে ত্রিপাদ চতুষ্পাদাদি প্রচার। অষ্টপাদ পর্যন্ত এ সীমাসুনির্ধার ॥

অর্থাৎ যে গানে উদ্‌গ্রাহ ও আভোগের মাত্রাসংখ্যা সমান, কিন্তু ধ্রুব ধাতুর মাত্রাসংখ্যা কম তাকে 'চিত্রকলা' বলে। চিত্রকলার চরণসংখ্যা সাধারণতঃ (৩×২=)৬, অন্তরা যোগ করলে (৪×২=)৮; তবে এই গান (৮×২=)১৬ চরণ পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তিনি গীতগোবিন্দের 'হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে'-শীর্ষক অষ্টপদী গীতটি এবং গোবিন্দদাসের একটি গান উদ্ধৃত করেছেন :

মুখরিত মুরলী-মিলিত মুখমোদনে মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান মথন মৃচুকায়নি মুনি মানস মুরছান ॥
মাই মোহন মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে-মনোরথ মাধুরি মনমথ মন মথ মারি ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিত মল্লী মধুর মধু মাধুবী মালতি মঞ্জুল মাল।
মন্দ মরন্দ-মুদিত মত মধুকর মণ্ডিত মৌলি মন্দার ॥
মাথহিঁ মৌর-মুকুট মদ-মন্থর রমণীমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর-মহিম মহিমাময় গোবিন্দদাস গুণগান ॥

ধ্রুবপদা পূর্বোক্ত চিত্রপদা ও চিত্রকলার লক্ষণসমন্বিত :

চিত্রপদা চিত্রকলা লক্ষণ সংযুক্ত ধ্রুবপদাগীত এই জানা শাস্ত্র-উক্ত ॥
কেহো কহে ইথে ধ্রুবাভোগপদদ্বয়। কেহো কহে উদ্‌গ্রাহ ধ্রুবাভোগত্রয় ॥
কেহো কহে ধ্রুবান্তরাভোগ ইহাতে। ধ্রুবপদা গীত অতি সুগম শাস্ত্রেতে ॥

অর্থাৎ চিত্রপদা ও চিত্রকলায় যে সব লক্ষণ আছে ধ্রুবপদায় তার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্রপদায় ধাতুর বৈচিত্র্য নেই, ধ্রুবপদায় আছে এবং চিত্রকলার মত ধ্রুবপদায় ধ্রুবপদ সর্বত্র ন্যূনমাত্রিক নয়, অনেকক্ষেত্রে সমমাত্রিক। ধ্রুবপদার বৈশিষ্ট্য ধাতুর বৈচিত্র্যে। এই বৈচিত্র্য অনুসারে ধ্রুবপদার কাঠামো নানারকম : (১) ধ্রুব+আভোগ, (২) উদ্‌গ্রাহ+ধ্রুব+আভোগ, (৩) ধ্রুব+অন্তরা+আভোগ। বোধহয় এই ধাতুবৈচিত্র্যের জন্যই ধ্রুবপদা সঙ্গীতশাস্ত্রের বিচারে বিশিষ্টতার অধিকারী ছিল। উদাহরণস্বরূপ নরহরি তিন রকম কাঠামোর তিনটি পদ উদ্ধৃত করেছেন :

(১) ধ্রুব+আভোগ :

জয় জয় নটনাগর রসসাগর গিরিধারী।
সুন্দরবর বসনচৌর অঞ্জননিভ নবকিশোর তরুণীধৃতিভঞ্জন জনরঞ্জন গুণভারী ॥ ধ্রু ॥
মুরলীধর পরমধীর শোভাকর বরজবীর মন্মথমদহর সরসিজ-লোচন রুচিকারী ।
যমুনাজল-কেলিদক্ষ সুতনুশয়নশেজ বক্ষ-মঞ্জুল মুখচন্দ্রকিরণ নরহরি বলিহারি ॥

(২) উদ্গ্রাহ+ধ্রুব+আভোগ :

কেশব কমলদলেক্ষণ কামদ- কান্ত মুরা ২ক কলিত সুরেশ।
নন্দতনুজ জনরঞ্জন ভবভয়- ভঞ্জন কঞ্জচরণকমলেশ ॥ উদ্গ্রাহ
জয় জয় গোপ বধূবদনাম্বুজ- মত্ত মধুপ মকরধ্বজ-ভূপ।
পীতাম্বর বর নাগর রসময় মঞ্জুলভুক্ত দলিতাঞ্জন রূপ ॥ ধ্রুব ॥
পরমানন্দ-কন্দ মধুরাধর- মুরলীবাদ্যধুরন্ধর ধীব।
নরহরিমব মধুসূদন মাধব গোবর্ধনধর গোকুলবীর ॥ আভোগ

(৩) ধ্রুব+অন্তরা+আভোগ :

দেখ দেখ সোই মুরতিময় নেহ।
কাঞ্চনকান্তি সুধা জিনি মধুরিম নয়ন-চমক ভরি লেহ ॥ ধ্রুব ॥
শ্যামল বরণ মধুর-রস-ঔষধি পুরুব যো গোকুল মাহ।
উপজল জগত যুবতি উমতা-অল যাক সৌরভ পরবাহ ॥
যো রস-বরজ গোপীকুচমণ্ডল মণ্ডলবর করি রাখি।
তে ভেল গৌর গৌড় অব আওল প্রকট প্রেম সুরশাখী ॥ [অন্তরা]
সকল ভুবনসুখ কীর্তন-সম্পদ মাতি রহল দিনরাতি।
ভবদেব কৌন কৌন কলিকল্মষ যাঁহা হরিবল্লভ ভাঁতি ॥ [আভোগ]

ক্ষুদ্রগীতের চতুর্থ ভাগ 'পাঞ্চালী' সম্পর্কে নরহরি বিশদ কিছু না বলে শুধু বলেছেন :

'বহুপদে পাঞ্চালী শাস্ত্রেতে নিরূপয়। সধ্রুব অধ্রুব সে দ্বিবিধ সুনিশ্চয় ॥'

এবং 'বাহুল্যভয়েতে' উদাহরণ না দিয়ে শুধু বলেছেন 'এ সুলভ গৌড়ে পাঞ্চালী প্রসিদ্ধ হয়। ঐছে ভাষান্তরে কবি যথেচ্ছ বর্ণয় ॥' এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় পাঞ্চালীর পদসংখ্যার কোন সুনির্দিষ্ট সীমা ছিল না।

গীতের পূর্বোক্ত শ্রেণীভেদ ছাড়াও তিনি আরো দুরকম শ্রেণীভাগ করেছেন : (১) ভাষাভিত্তিক : দিব্য, মানুষ ও দিব্য-মানুষ। গানের ভাষা পুরোপুরি সংস্কৃত হলে তা দিব্য গীত। গানের ভাষা প্রাকৃত তথা দেশী হলে তা 'মানুষ' গীত এবং গানের ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত (দেশী)-মিশ্র হলে তা দিব্য মানুষ গীত। (২) পদের মাত্রাভিত্তিক : সম, অর্ধসম ও বিষম। যে গানের

চারটি পাদ অর্থাৎ আটটি চরণই সমমাত্রিক তা সম, যার প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ সমমাত্রিক তা অর্ধসম এবং যার চার পাদের মাত্রা-সংখ্যা বিভিন্ন রকম তা বিষম গীত।

ধাতু, ভাষা ও মাত্রাভেদে নরহরি গানের যে শ্রেণীভেদ করেছেন তাকে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর স্থানকাল-নিরপেক্ষ ক্লাসিক্যাল রূপের বিশ্লেষণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই বিশ্লেষণ ক্লাসিক্যাল বলেই এতে পদাবলীর শুধু রীতিসিদ্ধ রূপবন্ধেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তার উদ্ভব ও ক্রমপরিণামের পরিচয় সেখানে ধরা পড়ে না। পদাবলীর রূপবন্ধের উৎসসন্ধানে সঙ্গীতের ঐতিহাসিকেরা আরও একটু পিছনে গিয়ে এর সঙ্গে নানা ধরনের 'ক্ষুদ্র' গীতের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে চান। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'চর্যা কিংবা বজ্রগীতির পরিচয় দিতে গেলে বলা যায়, এ দুটি বাংলা দেশের নিজস্ব নিবদ্ধ প্রবন্ধ বৌদ্ধ গীতি তথা ক্লাসিক্যাল অভিধানযুক্ত অভিজাত পদ গান ছিল এবং এই গীতিই পরবর্তীকালে কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেবকে 'গীতগোবিন্দ' গীতরচনায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নামকীর্তনের রূপায়ণে ও ঠাকুর নরোত্তমকে রসকীর্তনের প্রবন্ধরূপ দিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল' (রাগ ও রূপ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬)। বলা বাহুল্য, চর্যা ও বজ্র-গীতির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর যোগ উপলক্ষ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, প্রধানতঃ উপস্থাপনার দিক থেকে। চর্যা ও বজ্র গীতির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাচীনতর কালে সাধন-ভজনের জন্য যে ভক্তিগীতি রচনার ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছিল পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীতে সেই সাঙ্গীতিক প্রথাই অনুসৃত হয়েছে। চর্যা ও বজ্রগীতি ছাড়াও এই উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি 'প্রবন্ধ' গীতি প্রচলিত ছিল, এগুলি 'করণপ্রবন্ধ' নামে পরিচিত। এই 'করণ প্রবন্ধে'র একটি শ্রেণীর নাম 'কীর্তিলহরী'। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে 'Kirtilahari-Karana-prabandha was designed after the form of Kirtana or padavali-kirtana' (A Historical study of Indian Music, p. 453)। কাজেই বোঝা যাচ্ছে উৎসের দিক থেকে পদাবলী ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রকৃতপক্ষে দেবপূজা উপলক্ষে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের কাহিনী নিয়ে নানা ধরনের দেবমহিমাজ্ঞাপক নাচ-গান-বাজনার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই ছিল, সেই সব বিভিন্ন সাঙ্গীতিক রীতি পরবর্তীকালে বিভিন্ন

প্রাদেশিক ভাষায় বিভিন্ন ধরনের গীতরূপ সৃষ্টি করেছে; পদাবলী তারই অন্যতম। পদাবলী ঠিক কবে ও কার দ্বারা সূচিত হয়েছে তা নিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। তবে মনে হয় রাগসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক নানা রাজসভাতেই এর অনুশীলন প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যাপারে মিথিলার রাজসভাপুষ্ট নানা মৈথিল গায়কসংসদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত লোচন শর্মার 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে এ ব্যাপারে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। লোচনের বিবৃতি থেকে জানা যায়, মিথিলার রাজা শিবসিংহের রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞেরা সুরচর্চার দ্বারা যেসব রাগসৃষ্টি করেছিলেন, সেই রাগগুলি গান করার জন্য কবি বিদ্যাপতি কতকগুলি ধ্রুবাগীতি রচনা করেছিলেন, সেই গানগুলি রাজসভায় গাইতেন শিবসিংহের অনুগ্রহপুষ্ট শ্রেষ্ঠ গায়ক জয়ত।[১] এই জয়তের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে এই গানের ধারা বজায় রেখেছিলেন। এই ধারায় ছিল বিদ্যাপতির নিজের রচনা ও তাঁর অনুকৃত গান। লোচন 'রাগতরঙ্গিণী'তে এই সব 'কাব্যবর্ণানুবন্ধ' রাগের সংকলন করেছেন। লোচনের এই বিবৃতি থেকে কতকগুলি বিষয় অনুধাবন করা যায়: ১. বিদ্যাপতির ধ্রুবা গীতিগুলি রাগবিস্তার তথা গানের প্রয়োজনে রচিত, নিছক কবিতা হিসাবে রচিত নয়; ২. ধ্রুবা গীতগুলিকে কেন্দ্র করে অন্য ধাতুর সহযোগে প্রবন্ধগীতের পূর্ণাঙ্গরূপ পরিস্ফুট হয়েছিল। এই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধগীতিই পদাবলীর সাহিত্যরূপ (text); ৩. ভণিতাহীন ধ্রুবা গীতি ও ভণিতাযুক্ত প্রবন্ধগীতি অবলম্বনে বিদ্যাপতি থেকে লোচনশর্মা অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সময়ে মিথিলায় গীতিনির্ভর কাব্যচর্চার একটি ধারা অব্যাহত ছিল। রাগতরঙ্গিণীতে এই ধরনের গানই সংকলিত হয়েছে।

লোচনের বিবৃতিতে মিথিলায় কীভাবে রাগসঙ্গীতের চর্চা উপলক্ষে পদাবলী সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল তার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এর বিস্তার কোথায় ও কীভাবে হয়েছিল তার কোন ইঙ্গিত নেই। সে ইঙ্গিত পাওয়া যায় রাগতরঙ্গিণীর সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃতকে মিলিয়ে পড়লে। চৈতন্যচরিতামৃতে কয়েকটি ভণিতাহীন ধ্রুবা গীতি উল্লিখিত হয়েছে। চরিতামৃতের এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় এই গানগুলি চৈতন্যদেবের পূর্বে ও সমকালে বাংলার ভাগীরথী-তীরবর্তী বৈষ্ণব মণ্ডলে গীত হত। চরিতামৃতে উদ্ধৃত ধ্রুবা গীতির মধ্যে একটি হচ্ছে 'কি কহব রে সখী আজুক আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥' পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদসংকলনে বিদ্যাপতির ভণিতায় এই ধ্রুবাগীতির বর্ধিত রূপ পাওয়া গিয়েছে (দ্রঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, সুকুমার সেন)। এই বিবর্ধন বিদ্যাপতির দ্বারাও হতে পারে, আবার পরবর্তী কোন গায়ন বা কবির দ্বারাও হতে পারে। তবে বিবর্ধিত অংশে বাংলা পদের মিশ্রণ দেখে মনে হয় বিবর্ধনের ব্যাপারে বিদ্যাপতি ছাড়াও অন্য ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকা অসম্ভব নয়। তবে বিবর্ধন যার দ্বারাই হোক, এই বিবর্ধনের দ্বারা মধ্যযুগের কাব্যসংগীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরান্তর সূচিত হয়েছে। পদ যতদিন ধ্রুবাগীতির জন্য রচিত হয়েছে, ততদিন তাতে সুরেরই প্রাধান্য ছিল, কারণ ধ্রুবা গীতির পদকে অবলম্বন করে গায়ক সুর ও রাগের বিস্তার করতেন, সেখানে কথা বা কথাবদ্ধ ভাবের কোন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু যখন ধ্রুবাগীতির বিবর্ধন তথা বিভিন্ন ধাতুসহযোগে অবয়ববিস্তার ঘটল তখন কথার গুরুত্ব বাড়ল এবং শেষ পর্যন্ত কথা ও সুরের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হল, অর্থাৎ গানে কথা ও সুরের সমান গুরুত্ব স্থাপিত হল। পদসংগীতে এই কথা ও সুরের সামঞ্জস্য হয়ত শুধু বাংলাদেশেই সূচিত হয় নি, মিথিলা ও সন্নিহিত অঞ্চলেও তার সূচনা হয়েছিল (লোচনশর্মার রাগতরঙ্গিণী ও নেপালে প্রাপ্ত কিছু বৈষ্ণব পদে তার ইঙ্গিত আছে), কিন্তু বাংলা দেশের পদসংগীতে ভাবের গৌরব ও সুরের বৈচিত্র্য যতটা দেখা গিয়েছিল অন্যত্র ততটা হয় নি। কারণ অন্যত্র সংগীতের পদে যে ধাতুবিস্তার ঘটেছে তা অনেকটাই প্রথাবদ্ধ আলংকারিক প্রেরণায় সিদ্ধ, উপচীয়মান ভাবের প্রেরণা সেখানে বিশেষ কার্যকরী নয়। সেইজন্য ঐ অঞ্চলের গায়কেরা দেশী সুরকে আত্মসাৎ করলেও তাকে শাস্ত্রসম্মতভাবে মার্গীকৃত করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা গানে কথার গুরুত্বকে স্বীকার করলেও কাব্য ও সংগীতের আলংকারিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের দিব্যলীলা বাঙালীর মনে যে বিচিত্র ভাবান্দোলন জাগিয়েছিল তার প্রেরণায় কবি ও গায়কেরা কাব্যশাস্ত্র ও সংগীতশাস্ত্রের সমস্ত আলংকারিক প্রথাকে লঙ্ঘন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছেন: 'চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র-ছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল।

এই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সংগীতে বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে বসিল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা আর চলিল না। বাঁধন ভাঙ্গিল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নহে, তাহা সৃষ্টির উদ্যম।… বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখিতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরাজিতে রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট বলে। এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সংগীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিকিল না। তখন সংগীত এমন সকল সুর খুঁজিতে লাগিল যাহা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পাইয়াছিল, ওস্তাদজীর কাছে কীর্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটিয়াছে' (সংগীতের মুক্তি : সংগীত, রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪ শ খণ্ড, পৃ ৮৯৭)।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা কাব্যে ও সংগীতে যে বাঁধন-ভাঙ্গা 'স্বাতন্ত্র্যের উদ্যম' দেখা গিয়েছিল তাতে কাব্য ও সংগীতের আলংকারিক প্রথাকে লঙ্ঘন করার প্রবণতা থাকলেও কাব্য ও সংগীতের আলংকারিকেরা কিন্তু নিরস্ত হন নি। আলংকারিকেরা সেই স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেও আলংকারিক ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের পরিভাষায় এই চেষ্টার প্রবণতাকে বলা যেতে পারে neo-classicism। সে যুগের সাহিত্যে এই নব্য ক্লাসিকতার প্রমাণ রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' এবং সংগীতে এই নব্য ক্লাসিকতার দৃষ্টান্ত খেতরীর মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুরের রাগমার্গী কীর্তন গীতপদ্ধতি। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে পদাবলীর যে রূপবৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা এই নব্য ক্লাসিক গীতপদ্ধতির আদর্শেই রচিত। এই নব্য ক্লাসিক রীতি প্রথানুবর্তী বৈষ্ণব কবি ও গায়কসমাজে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করলেও নানা দিক থেকে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিল। এই প্রতিক্রিয়া প্রথম ধরা পড়ে গানে, এবং তারপর গানের সূত্রে কাব্যে। গানে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ নরোত্তম ঠাকুর-প্রবর্তিত রাগমার্গী কীর্তনের গীতপদ্ধতির পাশাপাশি অন্য কয়েকটি আঞ্চলিক গীতপদ্ধতির উদ্ভব। এখানে

উল্লেখযোগ্য, নরোত্তমের গীতপদ্ধতির নামটিও আঞ্চলিক (গরানহাটী), কিন্তু সরলতা ও গাম্ভীর্যে এটি অঞ্চলনিরপেক্ষ ধ্রুপদ মার্গের অনুরূপ, কাজেই একে কোন ক্রমেই আঞ্চলিক বলা যায় না। আসলে এই মার্গীকরণের দ্বারা নরোত্তম হয়ত ধ্রুপদী গায়কসমাজে কীর্তনের গৌরববৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পদাবলীর গৌরব শুধু রাগবিস্তারে নয়, ভাববিকাশেও বটে অর্থাৎ শুধু সুর নয় ভাবও তার প্রধান উপজীব্য, সেই জন্য ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গরানহাটী ঠাটের পাশাপাশি কীর্তন গানের সুর, তাল ও লয়েরও নানা বৈচিত্র্য দেখা দিল—কীর্তনের মনোহরশাহী, রেনেটী, মান্দারনী ও ঝাড়খণ্ডী ঠাট বা পদ্ধতি তার উদাহরণ। মনোহরশাহীর উদ্ভব বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগনায় (আধুনিক কাঁদরা-শ্রীখণ্ড অঞ্চলে)। এর লয় ও তাল সংক্ষিপ্ততর, সুর জটিলতর ও কারুকার্যমণ্ডিত। রেনেটীর উদ্ভব বর্ধমান জেলার রানীহাটী অঞ্চলে। এর লয় ও তাল সংক্ষিপ্ত, সুর সরলতর। মান্দারনীর প্রচলন মল্লভূমিতে, এর তাল সংক্ষিপ্ত, সুর সরল। ঝাড়খণ্ডী ঠাট আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুরের উপর প্রতিষ্ঠিত। হয়ত নিতান্ত অঞ্চলনিবদ্ধতার জন্যই মান্দারনী ও ঝাড়খণ্ডী ঠাট বেশী ব্যাপ্তিলাভ করতে পারে নি। তথাপি ধ্রুপদী গরানহাটী পদ্ধতির পাশে অন্যান্য আঞ্চলিক পদ্ধতির প্রচলনকে এক হিসাবে neo-classicism-এর বিরুদ্ধে রোমান্টিসিজমের বহুমুখী প্রতিক্রিয়া বলে ধরা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কালক্রমে শুদ্ধ সরল গরানহাটী পদ্ধতির পরিবর্তে মিশ্র ও জটিল সুরের মনোহরশাহী কিংবা মনোহর শাহী-রেনেটীর মিশ্রণই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কীর্তন গানের গীতপদ্ধতির আর একটি লক্ষণীয় পরিণাম গানের সময় মূল পদে গায়ক কর্তৃক আখর ও তুক-যোজনা। 'আখর' হচ্ছে মূল পদের অতিরিক্ত শব্দ বা শব্দসমষ্টি। আখরের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন: 'গানের অর্থ বিশদ করিবার জন্য, অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য, রচয়িতার গূঢ় মনোভাবকে সুরের বেদনায় প্রকাশ করিবার জন্য আখর দেওয়া হয়। গায়ক নিজে যাহা যোজনা করেন, তাহাই আখর। কোন কোনও সময় সুরের পোষকতায় আখরের স্থলে পদের অংশবিশেষের পুনরাবৃত্তিও করা হয়—অর্থাৎ গায়ক নিজের কথা না জুড়িয়া পদকর্তার ভাষাই হুবহু ব্যবহার করেন—তাহাকেও 'আখর'

বলা হয়। কিন্তু আখর অর্থে প্রধানতঃ গায়কের স্বকীয় যোজনা। অনেক সময়ে এই সকল আখর পূর্ববর্তী গায়কেরা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান গায়ক তাহারই আবৃত্তি করেন। আবার অনেক সময়ে গায়ক নিজ উদ্‌ভাবনী শক্তির সাহায্যে ভাবপোষক কথা সংযোজিত করেন। গায়কের কবিত্বশক্তি ও সুরতালের নৈপুণ্য থাকিলে এই সকল আখর অনেক সময়ে তত্তৎ পদাবলী অপেক্ষাও শ্রুতিমধুর হয়'।[২] আসলে 'আখর' মূল পদের ব্যাখ্যা করে না, মূল পদের ভাবানুষঙ্গী কথার সাজে মূল পদকে অলংকৃত করে। আখরের এই অলংকরণধর্মিতাকে ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র। একথাটা আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যদি কীর্তনের প্রাণ অর্থাৎ আখর কি বস্তু সেটা একটু ভেবে দেখা যায়। সেটা শুধু কথার তান নয় কি? হিন্দুস্থানী সংগীতে আমরা সুরের তান শুনে মুগ্ধ হই; সংগীতের সুরবৈচিত্র্য তানালাপে যেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ করি, নয় কি? কিন্তু কীর্তনে আমরা পদাবলীর মর্মগত ভাবরসটিকেই নানা আখরের মধ্যে দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর অর্থাৎ বাক্যের তান, অগ্নিচক্র থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ধিত হতে থাকে। সেই বেগবান্ অগ্নিচক্রটি হচ্ছে সঙ্গীতসম্মিলিত কাব্য। সংগীতই তাকে সেই আবেগ-বেগের তীব্রতা দিয়েছে যাতে করে নূতন নূতন আখর তা-থেকে ছিটিয়ে পড়তে পারে"।[৩] এই আখর বা 'বাক্যের তান' মোটামুটি দুরকম—কোথাও মূল পদেরই অংশবিশেষের শ্লিষ্ট পুনরাবৃত্তি, যেমন, 'এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি দেখয়ে খসায়ে চুলি'—মূল পদের এই অংশের আখর 'এলাইয়া বেণী—ফুলের গাঁথনি—দেখে কাল কেশে, কাল কে—সে? কাল কেশে' কিংবা 'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে যেমতি যোগিনী পারা'—এই অংশের আখর—'আহা রে আহারে। রতি নাই আহারে'। অন্যত্র পদানুষঙ্গী অথচ পদাতিরিক্ত নতুন শব্দ ও বাক্যযোজনা, যেমন, চণ্ডীদাসের নিজের রচনাংশ:

> না যাইও যমুনাজলে তরুয়া কদম্বতলে
> চিকণকালা করিয়াছে থানা।
> নব জলধর রূপ মুনি মন মোহে গো
> তেঞি জলে যেতে করি মানা॥

এর সঙ্গে আখর :

সখি মানা করিহে যেও না। যমুনার জলে যেও না। কদমতলায় যেও না।
চিকণকালা পেতেছে থানা। তেঁই তোমারে করি মানা।

এখানে নতুন ভাবের যোজনা নেই, আছে নতুন কথার যোজনা—মূল পদের নিজস্ব ভাবটিই এখানে নতুন কথার সাজে অলংকৃত ও স্ফুটতর হয়েছে।

'তুক' আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়তঃ আখরের থেকে আলাদা। আকারের দিক থেকে তুক আখরের চেয়ে দীর্ঘতর—আখর শব্দ বা শব্দসমষ্টি মাত্র, কিন্তু তুক পদ (=দুই চরণ) বা পদসমষ্টি। প্রকারের দিক থেকে আখর মূল ভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে তাকে অলংকৃত ও স্ফুটতর করে মাত্র, কিন্তু তুক মূল ভাবকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন, ঘনরাম দাসের মূল রচনা :

গোপালে সাজাইতে নন্দরানী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয়া হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জা হার॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙা চরণ ধরিয়া॥

এর পর গায়ক-যোজিত 'তুক' এবং তারপর কবি ঘনরামের 'আভোগ' :

ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রানী বদন হেরিতে॥

যে পদের পর 'তুক' যোগ করা হয়েছে সেই পদের ভাবের সঙ্গে তুকের ভাব মিলিয়ে দেখলেই কীর্তনে তুক-যোজনার উপযোগিতা বোঝা যাবে। 'তুকটি' হচ্ছে এই রকম :

নূপুর পরাবার কালে দেখে কত
শ্রীদাম চরণতলে রে।
সুবল দেইখা যা ভাই
পায়ে তুঞি আছিস আর আমি আছি রে॥
কানাই কভু মানুষ নয় ভাই।
আর এঠো দেওয়া হবে না রে।
এঠো খাওয়া বই।
আর কান্ধে চড়া হবে না রে।
কান্ধে করা বই॥

মূল গানের যে পদের পর তুক যুক্ত হয়েছে সেই পদে ভক্তিভাব তেমন সুপ্রকট নয়, কবি সেখানে বর্ণনা করছেন যে শ্রীদাম বালক কানাইয়ের ললাটে তিলক দিয়ে রাঙা পায়ে নূপুর পরালেন—এটি নিছক বর্ণনা মাত্র। কিন্তু গায়ক শুধু বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, এখানে শ্রীদাম-কর্তৃক কানাইয়ের চরণ-ধরার মধ্যে ভক্ত-কর্তৃক ভগবৎপদে আত্মনিবেদনের যে ভাবটি সম্ভাবনার আকারের অনুস্যূত হয়ে আছে সেই ভাবটি কবি প্রকাশ না করলেও গায়ক 'তুকে'র মধ্য দিয়ে তাকে বিশেষ ভাবে পল্লবিত করে তুললেন। ফলে কবির ভাব গায়কের 'তুকে'র মধ্য দিয়ে এক নতুন আধ্যাত্মিক মাত্রায় উন্নীত হলো, অর্থাৎ মূল গানে যা ছিল নিছক বর্ণনা, গায়কের কণ্ঠে তা পর্যবসিত হলো ভক্তের আপ্লুত বিহ্বলতায়। এইখানেই আখরের সঙ্গে তুকের তফাত। আখরে যেখানে প্রতিশব্দ দিয়ে উক্ত বা অনুক্ত ভাবের অলংকরণ, তুকে সেখানে নতুন বাক্যসমষ্টি দিয়ে কবির মূল ভাবকে গায়কের অভিপ্রেত সুরে রূপান্তরণ। সুতরাং 'তুকে' গায়ক 'আখর' অপেক্ষা বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করে থাকেন। কীর্তনে এই স্বাধীন 'তুক'-যোজনার রীতি সম্ভবতঃ কথকতার দ্বারা প্রভাবিত এবং সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকেই এই প্রভাব বিশেষভাবে সংক্রামিত হয়েছে। তুক-যোজনার পশ্চাৎ-ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন: 'পদাবলী ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক পড়িল, অথচ গান ভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা চালানো যায় না। সুতরাং সুর ও তাল থামিতে না দিয়া এবং ব্যাখ্যা-অংশকে যথাসম্ভব ছন্দে (অর্থাৎ ছড়ার ছন্দে) গাঁথিয়া পদ প্রসারিত করা হইল। এই ছন্দোময় ব্যাখ্যাত্মক ও ভাববিস্তারময় মূলপদাতিরিক্ত অংশকে বলে 'ছুট্' অথবা 'তুক' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, উত্তরার্ধ, পৃ. ৪০৩)।

তবে আখর ও তুকের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটা ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর গীতিসাহিত্যের একটা নতুন সাধারণ লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। এই সাধারণ লক্ষণটি হচ্ছে গানে সুরের চেয়ে কথার আপেক্ষিক গুরুত্ববৃদ্ধি (আগে গানে সুর ও কথার গুরুত্ব ছিল প্রায় সমান-সমান)। গানে কথার এই আপেক্ষিক গুরুত্ববৃদ্ধির পরিণাম ভালো ও মন্দ দুই-ই হয়েছিল। ভালোর দিকটা হচ্ছে, গানের সঙ্গে কথার বাহুল্যে কীর্তন গান সাধারণ শ্রোতার পক্ষে সহজগম্য হয়ে উঠেছিল। 'আখর' কথার সাজে ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করত,

আর 'তুক' বিস্তৃত ব্যাখ্যার সাহায্যে শ্রোতার রসবোধকে জাগিয়ে তুলত। তাছাড়া, কীর্তন গান পালার আকারে সাজিয়ে গাওয়া হত. 'তুক' অনেক সময় কীর্তনের পালাবিশেষের স্তর-পরম্পরার মধ্যে যোগস্থাপন করে এক ধরনের গতি সঞ্চার করত। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় একেই কীর্তন গানের ভাবপ্রকাশের 'নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি' বলে অভিহিত করেছেন।

গানে সুরের চেয়ে কথার গুরুত্ববৃদ্ধির দুষ্পরিণাম হলো গানে কথার ক্রমিক অসংযম। আগে কথা ও সুরের সামরস্য থাকায় গানে সুরের মাত্রাসম্মত সংযম বিরাজ করত। এমন কি যিনি ভাল আখর ও তুক যোগ যোজনা করতে পারতেন তাঁর বাঙ্‌নৈপুণ্যের জন্য তাঁর কথার বাহুল্য রসের হানি ঘটাত না। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কালপরিধিতে যখন বৈষ্ণব পদসংগীতের ভাবানুষঙ্গ অনুসরণ করে ঢপকীর্তন, কবিগান প্রভৃতি নতুন ধরনের গান জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন জনরুচির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ওইসব গানে কথার সংযম ও সুরের সম্ভ্রম স্খলিত হয়ে পড়ল। যেমন, ঢপকীর্তনে গানের চেয়ে গদ্য কথনপ্রবণতার প্রাধান্য দেখা দিল। ঢপকীর্তনের উদাহরণ:

কৃষ্ণবিরহে রাধা মূর্ছিতা হয়ে পড়েছেন। অতঃপর নারদের উপদেশে তাঁর কানের কাছে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করলে শ্রীমতী চেতনা পেলেন। পালা আরম্ভ হল।

'তখন ললিতা বলেন, ওগো রাধে! সেই নবীন নারদকায় শ্যামসুন্দর বৃন্দাবনে আগমন করেন নাই। ঐ দেখ দেবঋষি নারদ আগমন করেছেন। তখন শ্রীমতী দেবঋষি নারদকে নিরীক্ষণ করে কহিতেছেন, শুন নারদ, একবার বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবন নিরীক্ষণ কর দেখি। যেন সামান্য বন হইয়াছে। আর দেখ কৃষ্ণের প্রবল উজ্জ্বল বিরহানলে গোকুলনাথের গোকুলে গো-কুল প্রভৃতি পশুকুল সকলে ব্যাকুল হইয়াছে, আর নিকুঞ্জবন প্রভৃতি কিরূপ আছে তাহা শ্রবণ কর।

গীত।

দেখ না কুঞ্জে এ সুখ ভুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে বিচ্ছেদ-অনল।
গেছে সুখবল, আছে দুখানল, প্রতিঘরে হয় দাবানল॥
ছিল যার সুখে সুখ, সে-বিনে অসুখ, খেদে সারি শুক
কাঁদে তমালে।
না হেরে চাঁদমুখ, বিদরয়ে বুক, আর কি সে সুখ
হবে গোকুলে॥৪

এখানে পুরাতন লীলাকীর্তনের মতই 'মাথুর' পালা গাওয়া হয়েছে, কিন্তু

গানই এখানে মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে গানের আগে যে কথকতা ও সংলাপ আছে তা-ই। গানে আসলে প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করা হয়েছে মাত্র। তাই ঢপকীর্তন নামে কীর্তন হলেও আসলে পুরাতন কীর্তনের গীতপদ্ধতির সঙ্গে এর সংযোগ সামান্যই। ঢপকীর্তনে গানের চেয়ে কথনপ্রবণতার প্রাধান্য ঘটায় এখানে পদসংগীতের সাংগীতিক সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে।

অন্যদিকে কবিগানে মহড়া-খাদ-মেলতা-চিতেন-পাড়ন-ফুকা-মেলতা প্রভৃতি উপচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে গীতপদ্ধতির বৈচিত্র্য সূচিত হলেও, পদসংগীত হিসাবে কবিগান না গানের দিক থেকে, না পদ হিসাবে খুব একটা উৎকর্ষলাভ করতে পেরেছে। এর কারণ কবিগানের সাঙ্গীতিক ও সাহিত্যিক (textual) অংশের মূল লক্ষ্য একটাই—'সর্বসাধারণ-নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন' শ্রোতৃসমাজের তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জন। এই শ্রোতৃসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যিক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে' (কবিসংগীত : লোকসাহিত্য)। এই জন্য কবিগানের সুরের মধ্যে রাগরাগিণীর সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির পরিবর্তে কোলাহলময় চমকপ্রদ তাল-প্রয়োগই প্রাধান্য লাভ করত এবং ঠিক একই চমক সৃষ্টির কারণে গানের ভাবে স্থূল রসের উত্তেজক ফেনিলতা ও গানের ভাষায় চতুর অনুপ্রাসের সশব্দ প্রত্যাঘাত গুরুত্ব লাভ করত। হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী বা অন্য দু-একজন কবিওয়ালার বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা সত্ত্বেও এটাই হচ্ছে কবিগানের সাধারণ পরিচয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগে কীর্তনের আদর্শকে অবলম্বন করে বাংলা পদসংগীতে কথা ও সুরের যে সুষম অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার ঐতিহ্য অবলম্বন করা সত্ত্বেও আঠারো বা উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যায়ের ঢপকীর্তন ও কবিগানে পদসংগীতের সেই সৌষম্য বিচলিত হয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য, এর কারণ হচ্ছে কথা ও সুরের মধ্যে কথার আপেক্ষিক বাহুল্য ও অমিত প্রগল্‌ভতা যা ঢপকীর্তন ও কবিগানের ক্ষেত্রে সুরকে অতিক্রম করে গিয়েছে। ঢপ বা কবিগানে পদসংগীতের এই অপভ্রংশকে অবশ্য পুরোপুরি যুগপ্রভাবজাত বলে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না।

কারণ, এই যুগের আবিলতা ঢপ, খেউড় বা কবিগানে সংক্রামিত হলেও শ্যামাসঙ্গীতের অমল পদাবলী এই যুগেরই ফসল। শুধু শ্যামাসঙ্গীত নয়, বাউলসঙ্গীত ও বিশেষ বিশেষ লোকসংগীতেও পদসংগীতের গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। এর কারণ এই ধরনের গানে কথা ও সুরের সামরস্য বিচলিত হয় নি। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, একই যুগের একধরনের গানে যুগের আবিলতা সংক্রামিত হয়েছে, অথচ অন্য ধরনের গান তা থেকে মুক্ত থেকেছে, এটা কি করে সম্ভব? এটা এই কারণে সম্ভব যে, এই দুই ধরনের গানের উৎস ও উপলক্ষ ছিল ভিন্ন। কীর্তনের মত ঢপ, খেউড় বা কবিগানও ছিল অনুষ্ঠান-তথা উপলক্ষ-বা সমবেত শ্রোতৃনির্ভর, কিন্তু শ্যামাসঙ্গীত, বাউল গান বা বিশেষ ধরনের লোকসংগীত (যেমন, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি) একান্তভাবে উপলক্ষ-বা আনুষ্ঠানিক শ্রোতৃনির্ভর নয়। এই ধরনের গান অনুষ্ঠান উপলক্ষে গীত হতে বাধা ছিল না, কিন্তু এগুলির উদ্ভব ও বিকাশের জন্য অনুষ্ঠানবিশেষ অপরিহার্যও ছিল না। এই গানগুলি ছিল অনেক পরিমাণে অন্তর্মুখী ও গায়কের পক্ষে আত্মোপলব্ধিনির্ভর। এই ধরনের গানের এই আত্মকেন্দ্রিক ও অন্তর্মুখী প্রকৃতির জন্য এ সবের মধ্যে যুগের আবিলতা ছাপ ফেলতে পারে নি। গায়কের নিজের রুচি, ভাবপ্রকাশদক্ষতা ও গীতক্ষমতাই এই ধরনের গানের সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পক্ষান্তরে, ঢপ-খেউড়-কবিগান শ্রেণীর গানের সঙ্গে গায়ক বা গায়কদলের জীবিকার প্রশ্নটি জড়িত ছিল। তাই তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছে উপলক্ষের এবং জনরুচির, আর এই জীবিকার্জনের বহির্মুখী প্রেরণাই তাঁদের রচনার সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক প্রকৃতির মধ্যে যুগরুচির আবিলতা সঞ্চার করেছে। এই জাতীয় গানে এই কারণেই আদিরসের এত মাদকতা, অনুপ্রাসের এত প্রগল্‌ভতা ও বাদ্যযন্ত্রের এমন উল্লোলতা—যা শ্রোতাকে চিন্তা করাত না, উত্তেজিত করত, এবং যা শ্রোতার কাছ থেকে রসবোধ দাবী করত না, আদায় করত উত্তেজনার পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ কাঞ্চনমূল্য।

তাহলে মধ্যযুগের শেষ দিকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রীতির দিক থেকে পদসংগীতের দুটি প্রধান রূপ দাঁড়াল: একটি সম্মেলক ও একান্ত-ভাবে বাহ্য অনুষ্ঠাননির্ভর। অন্যটি অন্তর্মুখী, একক ও আত্মমগ্ন। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম রূপটি মধ্যযুগের পদসংগীতের অন্তিম পরিণাম, দ্বিতীয়টি যুগান্তরের

সূচনা। দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যা ও বজ্রগীতিতে যার সূচনা, পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কীর্তনে যার পরিপুষ্ট অভিব্যক্তি, অষ্টাদশ শতকের ঢপ-খেউড়-কবিগানে সেই পদসংগীতের জীর্ণতার লক্ষণ ফুটে উঠল।[৫] জীর্ণতা এই কারণে যে, আগে এই জাতীয় গান অনুষ্ঠাননির্ভর হলেও তার রূপ ও রীতি একান্তভাবে অনুষ্ঠাননিয়ন্ত্রিত ছিল না। বিশেষ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ, এমন কি সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেও পদসংগীতে কথার ভাব গানের রাগ ও তালকে নির্ধারণ করত এবং গানের ধাতু ও তাল গীতবাণীর আকার ও ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু ক্রমে একদিকে যেমন সুরের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ স্বাধীনতা গৃহীত হতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে জনরুচির চাহিদা অনুসারে গানের সঙ্গে শ্লেষ ও অনুপ্রাসবহুল কথকতা ও সংলাপ যুক্ত হয়ে পদসংগীতের আকার ও ভাববস্তুকে পরিবর্তিত করল, ফলে কীর্তন ও কীর্তনা-শ্রয়ী পদসংগীতের (যথা, ঢপ ও কবিগান) নিজস্ব কাঠামোয় অনুষ্ঠানের প্রভাব গুরুতর হয়ে উঠল। অর্থাৎ এই ধরনের পদসংগীত সাংগীতিক ও সাহিত্যিক নিজস্বতা হারিয়ে একেবারে অনুষ্ঠানকবলিত হয়ে পড়ল। পক্ষান্তরে, অপর শ্রেণীর পদসংগীতে (যথা, শ্যামাসংগীত, বাউল গান ইত্যাদি) অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ প্রভাব রইল না। তার জায়গায় প্রেরণা জোগাল কবির ব্যক্তিগত অনুভব। এই অনুভবে মধ্যযুগসুলভ ধর্মভাবুকতা যুক্ত থাকলেও এই ধর্মভাবুকতা কবির স্বকণ্ঠে উচ্চারিত, কীর্তনের মত রাধা বা কৃষ্ণের মুখে আরোপিত নয়। এর ফলে পদসংগীতে এক ধরনের মুক্তির লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। এই মুক্তি আনুষ্ঠানিকতার প্রথাবন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তি কবিকে একদিকে যেমন ভাববস্তুর ব্যাপারে, অন্যদিকে তেমনি রাগরূপের বিকাশেও যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদসংগীতের এই যে নতুন সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে পরবর্তী দুই শতকে। সে প্রসঙ্গ অবশ্য এখানে আলোচ্য নয়।

২. আখ্যানসংগীত : পাঁচালী

নরহরি তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনায় 'ক্ষুদ্রগীত' তথা সাহিত্যে প্রাপ্ত গানের যে চারটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তার মধ্যে তিনি মাত্র তিনটি শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন ও উদাহরণ দিয়েছেন, কিন্তু চতুর্থ প্রকার ক্ষুদ্রগীত অর্থাৎ 'পাঞ্চালী'র

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি বা তার উদাহরণও দেন নি। বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শুধু এইটুকু বলেছেন :

বহুপদে পাঞ্চালী শাস্ত্রেতে নিরূপয়।
সঞ্জব অঞ্জব সে দ্বিবিধ সুনিশ্চয়॥
এ সুলভ গৌড়ে পাঞ্চালী প্রসিদ্ধ হয়।
ঐছে ভাষান্তরে কবি যথেচ্ছ বর্ণয়॥ (গীতচন্দ্রোদয়)

এবং 'পাঞ্চালী'র উদাহরণ সম্পর্কে বলেছেন : 'বাহুল্য ভয়েতে উদাহরণ না দিয়ে'। নরহরির এই বিবৃতি খুব সুস্পষ্ট না হলেও এ থেকে পাঞ্চালী বা পাঁচালী সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যের আভাস পাওয়া যায় : (১) পাঞ্চালী বহুপদবিশিষ্ট —অর্থাৎ পাঞ্চালীর পদসংখ্যা অন্য তিনপ্রকার 'ক্ষুদ্র' গীতের মত সীমাবদ্ধ নয়, (২) পাঞ্চালী দু-রকম—সঞ্জব ও অঞ্জব, এর ব্যাখ্যায় রাজ্যেশ্বর মিত্র বলেছেন : 'অর্থাৎ এটি সম্মেলকভাবে অনুষ্ঠিত হত আবার একক ভাবেও গাওয়া হত' (প্রাচীন বাংলার সঙ্গীত, পৃ. ৪৩) ; (৩) পাঞ্চালী গৌড়দেশে অর্থাৎ বাংলায় 'সুলভ' অর্থাৎ বহুপ্রচলিত ছিল, তবে নরহরি-উদাহৃত অপরাপর ক্ষুদ্রগীতের মত এটি সংস্কৃত বা ব্রজবুলিতে রচিত নয়, 'ভাষান্তরে' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় রচিত ; (৫) 'কবি যথেচ্ছ বর্ণয়' — অর্থাৎ এটি গান-রূপে স্বীকৃত হলেও এতে রাগের বিস্তার অপেক্ষা বিষয়ের বর্ণনাই প্রধান ছিল। কবি গীতবিশেষের ধাতুগত কাঠামো অনুসরণ না করে ইচ্ছামত এর কলেবর নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাঞ্চালীর উদাহরণ সম্পর্কে তাঁর যে 'বাহুল্যভয়' সে এই কারণেই—অর্থাৎ তিনি যে পাঞ্চালীর উদাহরণ দেন নি তা উদ্ধৃতির সংখ্যা-বাহুল্যের ভয়ে নয়, আকারগত বাহুল্যের ভয়ে।

যাই হোক, নরহরি পাঞ্চালী সম্পর্কে বিশদ কিছু না বললেও তাঁর আলোচনায় 'পাঞ্চালী'র নামোল্লেখের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। নরহরি অপর তিনটি ক্ষুদ্র গীতের আলোচনায় যে সব উদাহরণ দিয়েছেন তার সবই সংস্কৃত ও ব্রজবুলিতে রচিত, কোনটিই বাংলায় নয়। অথচ তাঁর আগে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রমুখ বড় বড় পদরচয়িতা বাংলায় পদ রচনা করে গিয়েছেন। এঁদের রচনা যে নরহরির উদাহরণে স্থান পায়নি, তার কারণ তিনি ক্ষুদ্র গীতের যেসব বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন এঁদের বাংলা পদ হয়ত সর্বাংশে সেইসব বৈশিষ্ট্যের অনুবর্তন করে নি। যাঁরা বাংলায় পদ

লিখেছেন তাঁরা হয়ত প্রবন্ধগীতের বাইরের কাঠামোটুকুই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ধাতুসম্মেলনের ব্যাপারে প্রতিক্ষেত্রেই কোন বিশেষ শাস্ত্রসম্মত প্যাটার্ন বা ছাঁদ অনুসরণ করেন নি। নরহরি তাই তাঁদের রচনা ধ্রুবপদা-চিত্রপদা-চিত্রকলার উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেননি এবং প্রচলিত বাংলা রচনায় শাস্ত্রসম্মত গীতিরূপের অভাব থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই নরহরিকে নিজে পদ রচনা করে উদাহরণ দিতে হয়েছে। তিনি নিজেও যে উদাহরণগুলিকে বাংলা ভাষায় রচনা করেন নি, তার কারণ হয়ত তিনি যে ক্ল্যাসিক্যাল বা শাস্ত্রসম্মত গীতরূপের উদাহরণ দিতে চান তার পক্ষে বাংলা ভাষার অনির্দিষ্ট ধ্বনিপ্রকৃতির বদলে ব্রজবুলির কৃত্রিম তথা ধরাবাঁধা ক্ল্যাসিক্যাল ধ্বনিপ্রকৃতিই বেশী উপযোগী ছিল। সেদিক থেকে তাঁর আলোচনায় বাংলা পাঞ্চালী বা পাঁচালীর নামোল্লেখ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ শুধু নরহরির কাছে স্বীকৃতি নয়, এর অর্থ সমস্ত প্রাচীনপন্থী সংগীতবিদের কাছেই দেশীয় পাঁচালীর গীতরূপে স্বীকৃতি।

তবে নরহরি দেশীয় ভাষায় রচিত পাঁচালীকে গীতরূপে স্বীকৃতি দিলেও পাঁচালীর রূপ-রীতি সম্পর্কে বিশদ কিছুই বলেন নি। তাঁর বাংলা দুখানি বই ও সংস্কৃত 'সঙ্গীতসারসংগ্রহে' পাঞ্চালীর যে যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন, তা থেকে পাঁচালীর উদ্ভব ও গায়নপদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এজন্য এ সম্পর্কে, বিশেষতঃ পাঁচালীর উদ্ভব সম্পর্কে নানা ধরনের সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনা হয়েছে।[৬] এই সব অনুমানের মধ্যে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য অনেক পরিমাণে প্রণিধানযোগ্য ; এ সম্পর্কে তাঁর দুটি উক্তি উদ্ধৃত করি: (১) 'সেকালের দেবলীলা-নাটগীত অনেক সময় দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে শোভা-যাত্রায় হত বলে একে বলত যাত্রা। আর গোড়ার দিকে পুতুল-নাচের সঙ্গে হত বলে এর সাধারণ নাম হয়েছিল 'পাঁচালি'। পাঁচালি শব্দটি এসেছে 'পঞ্চালিকা' শব্দ থেকে। পঞ্চালিকা মানে পুতুল। মনে হয়, প্রথমে এই ধরনের পুতুল নাচের চলন ছিল পঞ্চাল দেশে। সেইজন্য পঞ্চালিকা নাম হয়।' (প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৪৭-৪৮)। (২) "'পাঞ্চালিকা' বোঝায় যে রচনাটি গান করিবার সময় কাহিনীর পাত্রপাত্রীর পুত্তলিকা অথবা চিত্র প্রদর্শিত হইত। 'মঙ্গল' আখ্যায়িকা-গানে পুত্তলিকা অথবা চিত্রপ্রদর্শনরীতি অনেক কাল আগেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তবে 'পাঞ্চালিকা' নামটি রচনার সৌষ্ঠব ও

আকর্ষণজ্ঞাপক বলিয়া টিকিয়া যায়, শুধু বাংলা দেশে নয় অন্যত্রও। গোড়ার দিকে মুকুন্দের কাব্যও যে চিত্রপ্রদর্শন অথবা পুত্তলি-নর্তন সহকারে গীত হইত তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ সো[নামুখী] পুথির একটি ভণিতায় (৭৭ ক) পাইয়াছি, 'রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ চিত্রের পাঁচালী মনোহরা॥" (ভূমিকা, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণ, পৃ. ৭)। অর্থাৎ ডঃ সেনের মতে, পাঁচালী দেবমহিমাবিষয়ক আখ্যানগান, এই গান করার সময় আগে পঞ্চালিকা বা পুতুলের সাহায্যে কাহিনীর পাত্রপাত্রীকে দৃষ্টিগোচর করে তোলা হত। পরে পুতুল-প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু গানের পদ্ধতি রয়ে যায় পঞ্চালিকার সংপ্রবস্মৃতি বহন করে, ফলে এই ধরনের গানের নামই দাঁড়ায় পঞ্চালিকা>পাঞ্চালী>পাঁচালী, পাঁচালি।

ডঃ সেনের অনুমানের সমর্থনে তেমন কোন জোরালো পাথুরে প্রমাণ পাওয়া না গেলেও নানা দিক থেকে তাঁর অনুমানে সত্যের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয় ; কারণ

(১) মধ্যযুগের বাংলাদেশে উৎসব উপলক্ষে যে পুতুলনাচের প্রচলন ছিল তা মধ্যযুগের কবিদের রচনা থেকে জানা যায় :

(ক) পোতলা নাচায় যেহ্ন সূতের সাতার।
বাদিয়া আলোপে যেহ্ন সূত রাখি কর॥

ইউসুফ জোলেখা : শাহ মুহম্মদ সগীর (১৫শ শতক)।৭

(খ) খেলয়ে নাচয়ে ফাগুরঙ্গ দশবিশে।
মৃত্তিকা-প্রতিমা কেহ দোলায় হরিষে॥

সতী ময়নামতী : দৌলত কাজী (১৭ শ শতক)।৮

(২) মধ্যযুগে 'পুতুলের' বিভিন্ন প্রতিশব্দের মধ্যে 'পঞ্চালিকা' শব্দটিও বাংলাদেশে অপরিচিত বা অপ্রচলিত ছিল না :

'তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চনপঞ্চালিকা'।

চৈতন্যচরিতামৃত : মধ্যলীলা/পরিচ্ছেদ ৮।

(৩) মধ্যযুগের কাব্যে 'পাঁচালী'/পাঁচালি'র সঙ্গে ঐ একই অর্থে 'পঞ্চালি' ও 'পঞ্চালিকা' এবং 'পাঞ্চালী' শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে :

(ক) 'সাবিরিদ হীনে ভণে পঞ্চালি বিঘোষ'।'

রসুলবিজয় (১৫-১৬ শ শতক)৯

(খ) 'শ্রীকবিকঙ্কণে গায় সুধী রঘুনাথ রায়
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ।'

কবিকঙ্কণচণ্ডী (১৬শ শতক)[১০]

(গ) 'তাহান আদেশ মাল্য শিরেত ধরিআ।
হীন আলাওল কহে পাঞ্চালী রচিআ॥'

তোহফা : সৈয়দ আলাওল (১৬৬৪)[১১]

কিন্তু এখানে কয়েকটি তথ্য মনে রাখা দরকার।

১. 'পাঁচালী' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে পঞ্চদশ শতকের আগে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। চর্যা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাঁচালী শব্দের উল্লেখ নেই। পাঁচালীর প্রথম উল্লেখ পাই কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, নারায়ণ দেব প্রমুখ পঞ্চদশ শতকীয় কবির রচনায়।

২. অথচ দেবলীলাবিষয়ক নানা গান পঞ্চদশ শতকের আগেই প্রচলিত ছিল। এই সব গানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মঙ্গলগীতি'। জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ'কে 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি' নামে অভিহিত করেছেন, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত-আবিষ্কৃত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক মুদ্রাপ্যমাণ 'নবচর্যাপদে'র একটি গানে (১০-১২ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত) চর্যাকেও মঙ্গলগীত-রূপে উল্লিখিত হতে দেখা যায় ('আলি কালি দুই পাদ ধরন্তে। এ চউ জোইনী মঙ্গলগীতে॥' ১৪ নং চর্যা, পৃ ২০) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দেখা যায় : 'ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল। জায়িতেঁ হরষিত মনে গায়িতেঁ মঙ্গল'॥ (নৌকাখণ্ড)।

৩. পঞ্চদশ শতকের পরেও, যখন পাঁচালী নামটি প্রচলিত হয়েছে তখনও বিশেষ ধরনের কাব্যকে 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গলগীত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই 'মঙ্গল' কাব্য কোথাও 'পাঁচালী' নামে অভিহিত হয়েছে (যেমন, নারায়ণদেব, মুকুন্দ চক্রবর্তী), কোথাও শুধু 'গীত' বা 'গান' রূপে উল্লিখিত, 'পাঁচালী'-রূপে নয় (যেমন, দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গল)।

৪. মধ্যযুগের কাব্যে 'পাঁচালী' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে এমন কাব্যের ক্ষেত্রেও যা 'মঙ্গল' নামাঙ্কিত কাব্য নয়, অনুবাদমূলক কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর কবির দ্বারাই রচিত এবং এই শ্রেণীর কাব্যের বিষয়ও সম্প্রদায়-বিশেষে সীমাবদ্ধ (যেমন, হিন্দুদের পক্ষে মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদ, কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ, কাশীরাম দাসের

মহাভারত অনুবাদ এবং মুসলমানদের পক্ষে শা-বিরিদ খানের রসুল বিজয়, আলাওলের তোহফা)। এই সব কাব্যের নাম যা-ই হোক, কবিরা নিজেদের কাব্যকে পাঁচালী-রূপে অভিহিত করেছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে 'মঙ্গল' ও 'পাঁচালী' নামদুটি কোথাও পরস্পরসাপেক্ষ, কোথাও অন্যনিরপেক্ষ। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে আগে 'মঙ্গল' গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সন্ধান করতে হয়, কারণ আমাদের সাহিত্যে 'পাঁচালী'র চেয়ে 'মঙ্গলে'র উল্লেখ পূর্ববর্তী।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে 'মঙ্গল' একটি প্রবন্ধগীত রূপে পরিচিত। ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে মঙ্গলপ্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলেছেন :

> কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ।
> বিলম্বিতলয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দসা তথা ॥ ৪।৩০৩

অর্থাৎ 'মঙ্গলপ্রবন্ধ কৈশিকী বা বোট্টরাগে গেয়, (শংখ চক্রাদি) মাঙ্গলিক পদে নিবদ্ধ ও বিলম্বিত লয়ে গেয় ; অথবা ইহা মঙ্গলছন্দে নিবদ্ধ।' মঙ্গলগানের কথা ত্রয়োদশ শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হলেও মঙ্গলগানের ঐতিহ্য আরও প্রাচীন। সঙ্গীতাচার্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ দেখিয়েছেন যে ৫ম শতকের কবি কালিদাসও তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যের অন্ততঃ দুই জায়গায় (৮।৮৫, ১১।৩০) কৈশিক রাগে গেয় মঙ্গলগীতের কথা উল্লেখ করেছেন। কৈশিক ছাড়াও অপর যে রাগটিতে মঙ্গলগীত গেয় সেই বোট্ট রাগেরও প্রয়োগ বেশ প্রাচীন, মতঙ্গের (৫ম-৭ম শতক) 'বৃহদ্দেশী'তে এই রাগের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। তবে রাগটি সম্ভবতঃ অনার্যমূল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন : 'Many of the regional and tribal tunes were formalised with the help of the sastric ten essentials (dasa-laksana), and they were christened after the tribes accordingly.···The raga botta or bhotta was also a tribal tune of Bhotadesa or the Tibetan-speaking people' (A Historical study of Indian Music. p. 140)। তাঁর অনুমান, বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তারসূত্রে যখন তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয় তখন সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম শতকের মধ্যে এই রাগ ভারতীয় সংগীতে

গৃহীত হয়। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন যে এই রাগ শিবের স্মরণে অনুষ্ঠেয় উৎসবে ব্যবহার্য: 'উৎসবে বিনিয়োক্তব্যো ভবানীপতিবল্লভঃ' (২।৫০)। এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'In Tantra and Purana, the Lord Siva has been given an exalted and venerable position, and perhaps being aware of it, Sarngadeva has connected this raga of the mountains with Siva, the presiding deity of the Himalayas' (Ibid, p. 143)।

পূর্বোক্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে :

১. কৈশিক ও বোট্ট রাগের গান শিবসংস্রবযুক্ত বলে উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় মঙ্গলগান মূলতঃ শিবমাহাত্ম্যমূলক গানই ছিল, কিন্তু হরিবংশে (২।৪৭।৮) যে মঙ্গলগানের উল্লেখ পাই তা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। জয়দেবের গীতগোবিন্দ 'মঙ্গলগীতি'-রূপে বর্ণিত, অথচ তা-ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক। নবচর্যাপদের মঙ্গলগীত-রূপে উল্লিখিত চর্যাটির স্মরণীয় দেবতা হেরুক। আর মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিববৃত্তান্ত উল্লিখিত হলেও তা আংশিক, তার প্রধান বর্ণনীয় দেবতা চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক দেবতা। তাহলে সঙ্গীতশাস্ত্রের মঙ্গলপ্রবন্ধের সঙ্গে পরবর্তী কালের মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাব্যের কোন যোগ আছে কি ?

২. সংগীতশাস্ত্রে মঙ্গলগানের জন্য দুটি রাগ নির্দেশ করা হয়েছে—কৈশিক ও বোট্ট। কিন্তু পরবর্তী কালের গীতগোবিন্দে, নবতর চর্যায় ও মঙ্গলকাব্যসমূহে এই দুটি রাগ তো নয়ই উপরন্তু ভিন্নতর অনেক রাগ ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে, সংগীতশাস্ত্রের মঙ্গলপ্রবন্ধের সঙ্গে পরবর্তী মঙ্গলনামাঙ্কিত গানগুলির কি কোন যোগ নেই ?

এই প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসায় নিম্নোক্ত অনুমান চলতে পারে :

১. মঙ্গলগান গোড়ায় শিবলীলাবিষয়ক গানই ছিল, পরে 'মঙ্গল' কথাটির অর্থপ্রসার ঘটে শিব ছাড়াও অন্য দেবতা এবং শেষ পর্যন্ত যে-কোন দেবতুল্য ব্যক্তির লীলাবিষয়ক গানে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ মঙ্গলগীত=শিববিষয়ক গান>যে কোন দেবতাবিষয়ক গান (এই অর্থে গীতগোবিন্দ, নবচর্যা, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি মঙ্গল গান)>যে কোন দেবতুল্য ব্যক্তির লীলাবিষয়ক গান (স্মরণীয় : 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অদ্বৈতমঙ্গল')।

২. যখনই মঙ্গলগানের বিষয়-পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, অনুমান করা যায়, তখনই নূতনতর বিষয়ভাবের প্রয়োজনে রাগ-রাগিণীরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে গানের শ্রেণীনাম হিসাবে 'মঙ্গল' শব্দটি মাত্র রয়ে গিয়েছে, কিন্তু গানে ভিন্নতর রাগের সংযোজন হয়েছে। শুধু তাই নয়, মঙ্গলগানের রূপ আদিতে যা ছিল মঙ্গলনামাঙ্কিত বাংলা রচনাতে নিশ্চয়ই তার পরিবর্তন হয়েছে। মঙ্গল-গান আদিতে নিশ্চয়ই প্রবন্ধগীতের সাধারণ রীতি অনুসারে উদ্‌গ্রাহ-মেলাপক-ধ্রুব ইত্যাদি ধাতুক্রমে গঠিত ছিল, কিন্তু বাংলা 'মঙ্গল' নামাঙ্কিত দীর্ঘ রচনাগুলিতে প্রবন্ধগীতের এই চিরাচরিত ধাতুক্রম অনুসৃত হয় নি। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাই অনুমান করেছেন: 'একটা কথা কিন্তু মনে জাগে যে মঙ্গলকাব্যের অতি বিস্তৃত পদাবলী কি ভাবে বড় বড় রাগে গাওয়া হত। এর তো স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নেই;—তবে মল্লার, বসন্ত, শ্রীরাগ—এই সব রাগের ব্যবহার এইসব পদাবলীতে কিভাবে হত? এর একমাত্র অনুমান এই হতে পারে যে এইসব রাগের কাঠামোটুকুই আবৃত্তির সুরে রক্ষিত হত; আর কিছু নয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শৈলী মঙ্গলকাব্যের গায়নপদ্ধতিতে অবলম্বন করবার সুযোগ ছিল না, কারণ মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্দেশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে সঙ্গীত প্রচার নয়' (প্রাচীন বাঙলার সংগীত, পৃ. ৭৮)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, 'মঙ্গল' নামক প্রবন্ধগীতের রূপ কালভেদে পরিবর্তিত হয়েছে এবং সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতকের দিকে বা তার কাছাকাছি সময়ে এই পরিবর্তনের সূত্র ধরে মিথিলা ও বাংলা অঞ্চলে মঙ্গলগানের একটি অভিনেয় রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অভিনেয় রূপটি 'নাটগীত' নামে পরিচিত। বঙ্গীয় কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং মৈথিল কবি উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ' এই ধরনের নাটগীত-জাতীয় মঙ্গলগানের উদাহরণ। এই কাব্যদুটি যে প্রকৃতিতে নাটগীত ধরনের তা এদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য বিচার করলেই বোঝা যায়। আর এগুলি যে 'মঙ্গল' জাতীয় রচনা তা কবিরা নিজেই কাব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন—জয়দেব বলেছেন 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি', আর 'পারিজাতহরণে' সূত্রধারের উক্তিতে আছে 'আদিষ্টোঽস্মি শ্রীহরিহরদেবেন যথা উমাপত্যুপাধ্যায়বিরচিতং নবপারিজাতমঙ্গলম্'। আঙ্গিক সাদৃশ্যে বোঝা যায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও 'গীতগোবিন্দ' ও

'পারিজাতহরণে'র মত নাটগীত-জাতীয় মঙ্গলগান। এই ধরনের বিবৃতি-বর্ণনা-সংলাপময় রচনাকে যে সেকালে 'নাটগীত' বলা হত তার প্রমাণ পাই ১৫শ-১৬শ শতকের কবি শাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে। শাবিরিদ খানের এই কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতই স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোকে দৃশ্যসংকেত দেওয়া আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতই এর কাব্যদেহ বিবৃতি-বর্ণনা ও সংলাপে গঠিত। এই কাব্যরূপকে শাবিরিদ খান 'নাটগীত' নামে অভিহিত করে বলেছেন :

> সাবিরিদ খানে ভণে বিজ্ঞজন স্থানে।
> অশুদ্ধ থাকিলে পদ শুধিবা যতনে ॥
> এ নাটগীতিতে তাল না করিবা ভঙ্গ।
> এক মনে শুনিলে বাড়িব মনোরঙ্গ ॥ ১২

এই নাটগীত সম্ভবতঃ মনুষ্য-অভিনীত ছিল (যেমন ১৭ সংখ্যক চর্যায় পাই 'নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী। /বুদ্ধনাটক বিসমা হোই'॥ এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাই 'নর্তকী নৃত্য করে / মন্দিরা ধরিয়া করে / গায়নে মঙ্গল গায় গীত।), তবে মনে হয় বিকল্পে পঞ্চালিকা বা পুতুল দিয়েও নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। কারণ মঙ্গলগানের মনুষ্য-অভিনীত নাটগীত বা নৃত্যাভিনয়ে যে-সুশিক্ষিত নর্তকী ও গায়কের প্রয়োজন তার ব্যয়নির্বাহ রাজা-ভূস্বামী বা ধনী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব ছিল না, পক্ষান্তরে নাটগীত ধনিগৃহ ছাড়াও সাধারণ স্থানে উপস্থাপিত হত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে কলিঙ্গযুদ্ধের অবসানে কালকেতুর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পর গুজরাটের সর্বত্র নাটগীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল : 'হাটে বা চাতরে মাঠে / নাটগীত গুজরাটে / সভার সুস্থির হইল মতি'। হাটে-মাঠে-চত্বরে যে নাটগীত অনুষ্ঠিত হ'ত তাতে ধনিগৃহের আনুকূল্যপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত নর্তকী ও গায়কদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আপেক্ষিকভাবে কম। সেক্ষেত্রে ব্যয়সংকোচের প্রয়োজনে পুতুল ও পটচিত্রের ব্যবহারই অধিকতর সম্ভাব্যতাপূর্ণ বলে মনে হয়।

প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলগান তথা দেবলীলাবিষয়ক গীতের সঙ্গে যে পঞ্চালিকা বা পুতুলের সংস্রব ছিল তা নিছক অনুমানের বিষয় নয়, এ ব্যাপারে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় দশম শতকের আলংকারিক ভোজরাজের 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' বইতে। এই বইতে তিনি কতকগুলি উৎসবের পরিচয় দিতে গিয়ে 'পাঞ্চালানুযান' নামে একটি উৎসবের উল্লেখ করেছেন :

'পাঞ্চালমুনিপ্রবর্তিতয়া ভিন্নভাষাবেষচেষ্টিতৈঃ প্রহাসক্রীড়া পাঞ্চালানুযানম্, তস্য ভূতমাতৃকেতি প্রসিদ্ধিঃ'। 'শৃঙ্গারপ্রকাশে'র এই বিবৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ ভি রাঘবন্ লিখেছেন : 'The passage is not fully clear, but it seems to refer to some goddess-image being carried, followed by damsels, and the illustrative verse in the S[arasvati] K[an tha] A[varan] shows that the damsels put on varied dress (nepathya) and dance. There is a celebration like this in Tamil literature called Pavai. Pavai means doll, image, panchalika. Damsels follow it singing and take it in procession. The Tamil vaisnavite religious poem of Andal named Tiruppavai adopts this celebration of Pavai as a literary form' (Bhoja's Sringaraprakas, p. 654)। 'শৃঙ্গারপ্রকাশে'র সূত্র ধরে বোঝা যায় দশম শতক বা তারও আগে উৎসব উপলক্ষে পঞ্চালিকা বা দেবপ্রতিমাকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হত। পেছন পেছন মেয়েরা নানা বেশ ধারণ করে 'ভিন্ন ভাষা'য় ['ভিন্ন ভাষা' বলতে সম্ভবতঃ সংস্কৃতের আঞ্চলিক ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে] নৃত্য, গীত ও অভিনয় করতে করতে অগ্রসর হত। পঞ্চালিকার অনুষঙ্গী এই গানই হয়ত পঞ্চালিকা বা পাঞ্চালী নামে অভিহিত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের ভক্তিমূলক 'পাবৈ' সাহিত্য আমাদের এই অনুমানের সমর্থক। আমাদের আরও অনুমান এই যে, দেবলীলাবিষয়ক 'মঙ্গলগীত' উত্তরভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বহু আগে থেকেই বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল, তবে 'পাঞ্চালী' বা পুতুল-প্রতিমার সংস্রববাহী নৃত্য-গীত-অভিনয়মূলক 'পঞ্চালিকা' বা 'পাঞ্চালী' গীতের 'ফর্ম' পরবর্তী কালে এ দেশে গৃহীত হয়। সংস্কৃত নাটকের ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাঞ্চালী-নাট্য বা পুতুলনাচের মধ্যে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের উৎস নির্দেশ করতে চেয়েছেন।[১৩] এই উৎস-নির্দেশের সমীচীনতা সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয়েও আমরা স্বচ্ছন্দে লক্ষ্য করি যে পুতুল-অভিনয় উত্তর ভারতের পরিবর্তে দক্ষিণ ভারতেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। রাঘবন্-উল্লিখিত 'পাবৈ' এই সত্যেরই ইঙ্গিত দেয়। অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের উৎসবে ও অনুষ্ঠানে পঞ্চালিকা বা পুতুল ব্যবহারের রীতি খুবই প্রশস্ত ছিল। আমাদের মনে হয়, দাক্ষিণাত্য

থেকে আগত সেন-রাজাদের আমলেই এই দক্ষিণভারতসুলভ নৃত্যাভিনয়সম্বলিত 'পাঞ্চালী' গীতের প্রথা বাংলাদেশেও প্রচলিত হয়। তবে ভোজ-বর্ণিত 'পাঞ্চালানুযান' বা দক্ষিণভারতীয় 'পাবৈ' বা পাঞ্চালী-গান থেকে বাংলা পাঞ্চালীর স্থানকালোচিত পরিবর্তন ঘটেছিল। কারণ 'পাঞ্চালানুযান' ও 'পাবৈ'-এর ক্ষেত্রে চলমান পাঞ্চালীর পেছন পেছন নৃত্যগীতাভিনয় করা হত। কিন্তু বাংলা পাঁচালীতে 'পাঞ্চালী' বা দেবপ্রতিমা স্থির এবং নৃত্য-গীত অভিনয় তাঁর সামনে অনুষ্ঠিত। কাজেই পরিবর্তনটা এই ভাবে হতে পারে : পাঞ্চালী= চলমান পাঞ্চালী বা প্রতিমার পশ্চাতে অনুষ্ঠিত নৃত্যাভিনয়ের গীত>স্থির পাঞ্চালী বা প্রতিমার সম্মুখে অনুষ্ঠিত নৃত্যাভিনয়ের গীত। বাংলা 'মঙ্গল' নামাঙ্কিত কাব্যগুলিকে কোন কোন কবি যে 'পাঁচালী' আখ্যা দিয়েছেন সে সম্ভবতঃ এই অর্থেই। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মঙ্গলকাব্যের সব কবিই তাঁদের রচনাকে 'পাঁচালী' বলেন নি, আবার কেউ কেউ এমন রচনাকেও 'পাঁচালী' বলেছেন যা আদৌ মঙ্গলগান নয়। কাজেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে পাঁচালী-গীতের নানা রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু এই রূপান্তর কোন্ কোন্ ধারায় কীভাবে ঘটেছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কারণ নিশ্চিত হবার মত উপযুক্ত তথ্য আমাদের হাতে নেই। কাজেই একমাত্র সম্বল তথ্যনির্ভর অনুমান।

মঙ্গলকাব্যের যেসব কবি তাঁদের কাব্যকে পাঁচালী নামে অভিহিত না করে গান বা গীতরূপে অভিহিত করেছেন, তাঁদের রচনায় একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে তাতে বর্ণনার সঙ্গে গানেরও একটা বড় ভূমিকা আছে (দ্র. বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত)। দ্বিজমাধবের বইতে গানের সংখ্যাই বেশী, মাঝে মাঝে বর্ণনা-অংশগুলি বিভিন্ন গানের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। দ্বিজমাধব এই যোজক রচনাগুলিকে 'পয়ার' নামে অভিহিত করেছেন, আর গেয় রচনাংশের আগে বিভিন্ন রাগের নামোল্লেখ করেছেন। বোধহয় 'পয়ার' নামোল্লেখের দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এই অংশ সুর-সহযোগে আবৃত্তি করতে হবে, এখানে সুরের বদলে বর্ণনাই মুখ্য, পক্ষান্তরে রাগ-উল্লেখের দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে এই অংশ উল্লিখিত রাগে গেয়, এই অংশে বর্ণনা নয়, প্রচলিত গানের মত সুরের বিস্তারই প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ 'পয়ার' এখানে ছন্দ-বিশেষের নাম নয়, সুরসহযোগে আবৃত্তিযোগ্য

বিশেষ রচনাপ্রকৃতির নাম। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে 'পয়ার' শব্দটি এই অর্থেই প্রচলিত ছিল। মালাধর এই অর্থেই বলেছিলেন 'ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া'—অর্থাৎ তিনি তাঁর কাব্যে সংস্কৃত ভাগবতের মর্মার্থ পয়ারে অর্থাৎ বিশেষ ধরনের পদবন্ধে বেঁধে প্রকাশ করেছেন। তিনি যে 'পয়ার' বলতে 'পয়ার' ছন্দকে বোঝান নি, তার প্রমাণ তাঁর কাব্যে পয়ার ছাড়াও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'পয়ার' যে ঐ সময় বিশেষ ধরনের পদবন্ধ বা রচনাপ্রকৃতিকে বোঝাত তার ইঙ্গিত পাই বিশ্বসিংহের সভাকবি পীতাম্বরের মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদে। ঐ কাব্যে কবি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর অনুগ্রাহক যুবরাজ সমরসিংহ তাঁকে আদেশ করে বলেছিলেন :

> পুরাণাদি শাস্ত্র আদি রহস্য আছয়।
> পণ্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয়।।
> এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।।
> নিজ দেশভাষা-বন্ধে রচিযো পয়াব।।

অর্থাৎ পয়ার হচ্ছে বিশেষ ধরনের দেশীয় পদবন্ধ, যার ভাষা দেশীয় বা বাংলা এবং যার উদ্দেশ্য কোন বিষয়কে সহজবোধ্য আকারে উপস্থাপিত করা। বস্তুত: মালাধরও একই অর্থে 'পয়ার' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই 'পয়ার' নামটির সঙ্গে 'পাঞ্চালী' 'পঞ্চালিকা' ও 'পাঁচালী' নামটি কখনো একীকৃত হয়েছে, কখনো বা পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ ধরনের পদবন্ধের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। একীকরণের দৃষ্টান্ত মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পীতাম্বরের দময়ন্তী চরিত্র, অনিরুদ্ধের 'ভারত পয়ার', আলাওলের 'তোহফা' ইত্যাদি (লক্ষণীয় : অনিরুদ্ধের কাছে ভারত-পাঁচালী = 'ভারতপয়ার')। এই একীকরণ ঠিক কবে ও কিভাবে হয়েছিল তা বলা কঠিন, তবে একীকরণের সম্ভাব্য কারণ এই যে উভয় শ্রেণীর রচনাই একদিক থেকে সমধর্মী—বর্ণনামূলক, সহজবোধ্য ও দেশীয় ভাষায় গ্রথিত। কিন্তু পাঁচালীতে বর্ণনা ছাড়াও নৃত্যগীতের অবকাশ ছিল, তাই হয়ত পয়ার ও পাঁচালী শেষ পর্যন্ত সমার্থক শব্দ হিসাবে থেকে যায় নি। পাঁচালী একটি বিশেষ ধরনের ব্যাপক রচনা যার সাহায্যে বর্ণনা, গীত ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হত, 'পয়ার' শুধু তার বর্ণনার উপযোগী রচনাটুকুর নাম হিসাবেই পরিচিত হল। যে পাঁচালীতে গান ও নৃত্যের প্রাধান্য সেখানে দুটি গানের মধ্যবর্তী 'পয়ার' বা বর্ণনা-অংশ ভাবগত শৃঙ্খল বা যোজক-সূত্রের কাজ

করত। এই জন্য এই শ্রেণীর পয়ারকে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে 'শিকলি' (<শৃঙ্খলিকা)। দ্বিজমাধব তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে যেসব রচনাকে 'পয়ার' বলে অভিহিত করেছেন সেগুলি এই 'শিকলি' শ্রেণীর পয়ার। কৃত্তিবাস যে তাঁর রামায়ণ-পাঁচালীর প্রত্যেক কাণ্ডের প্রথম পয়ারটিকে 'শিকলি' নামে অভিহিত করেছেন, সে-ও এই অর্থে, অর্থাৎ এই পয়ার দিয়ে পূর্ববর্তী কাণ্ডের সঙ্গে পরবর্তী কাণ্ডকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে। দ্বিজ মাধব তাঁর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে এই উদ্দেশ্যেই বলেছেন 'নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিশেষ' অর্থাৎ তাঁর কাব্যে 'শিকলি' ও 'নাচাড়ি' এই দুই শ্রেণীর রচনাই থাকবে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে 'শিকলি' অর্থাৎ বর্ণনাঅংশ এবং 'নাচাড়ি' অর্থাৎ গেয় অংশ প্রায় সমান সমান। তবে এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় (যথা, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল প্রভৃতি) পয়ারের পাশে নাচাড়ি জাতীয় রচনার উল্লেখ আছে এবং এই অংশের আগে অনেক ক্ষেত্রে রাগের নাম উল্লিখিত আছে। এ থেকে মনে হতে পারে যে 'নাচাড়ি'র অর্থ গান। 'নাচাড়ী' (ড়ি) গান বটে, কিন্তু যে কোন রকমের গান নয়। মধ্যযুগের পাঁচালীতে দুধরনের গান প্রচলিত ছিল—এক ধরনের গান রাগতাল সহযোগে একক বা সম্মেলকভাবে গেয়—এতে বাদ্যের সংস্রব থাকলেও নৃত্যের যোগ ছিল না। আর এক ধরনের গান নৃত্যসহযোগে গাওয়া হত—এর নামই নাচাড়ি (পাঠান্তরে 'লাচাড়ী' <নৃত্যপাটিকা)। এই নৃত্য নর্তকী, পাঞ্চালী (পুতুল) বা গায়নদ্বারা অনুষ্ঠিত হত। তবে এই নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এতে অভিনয়ের ভাবও যুক্ত হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে প্রায়ই আছে 'পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ীর ছন্দ' কিংবা 'লাচাড়ী পড়িল গাইন পয়ার বিচ্ছেদ', নারায়ণ দেব বলেছেন 'পয়ার এড়িয়া বোলম লাচাড়ী', মুকুন্দও পয়ারের পাশে নাচাড়ির কথা অনেকবার উল্লেখ করেছেন : 'ছায়ার প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত' কিংবা 'প্রশংসা প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত'। এই তিনজন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কবি পয়ার ও নাচাড়িকে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির পদবন্ধ বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই পার্থক্য উপস্থাপনাগত। পয়ার সুরসহযোগে পঠিতব্য বা আবৃত্তিযোগ্য পদবন্ধ আর নাচাড়ি নৃত্যসম্মিত গেয় পদবন্ধ। সাধারণভাবে মনে হতে পারে, পয়ার হচ্ছে ৮+৬ মাত্রার দ্বিপদী পদবন্ধ, আর নাচাড়ী ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদী

পদবন্ধ। কিন্তু এই পার্থক্য চূড়ান্ত বা যথার্থ নয়। কারণ পয়ার ৮+৬ মাত্রার হতে পারে, কিন্তু নাচাড়ী সর্বত্র ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদী নয়। অনেক ক্ষেত্রে দ্বিপদী নাচাড়ীরও সন্ধান মেলে :

সভে বলে খুল্লনার/বর মিল্যাচে ভাল।
মদনমোহন রূপে/ঘর কর্যাচে আল॥
এক যুবতী বলে সই/মোর কর্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর/দুই চক্ষু অন্ধ॥

কিংবা বিজয় গুপ্তের রচনায় একটি নাচাড়ি :

জগত মোহন/শিবের নাচ।
সঙ্গে নাচে শিবের/ভুত পিশাচ॥
রঙ্গে নেহালি/গৌরীর মুখ।
নাচে গঙ্গাধর/মনের কৌতুক॥

সুতরাং পয়ারের সঙ্গে নাচাড়ির প্রভেদ মাত্রা বা পর্বগত নয়, উপস্থাপনাগত। পয়ার বর্ণনীয় পদবন্ধ আর নাচাড়ি নৃত্যসংগত রচনাবন্ধ। আর নাচাড়িতে যে মাত্রা ও পর্ব-বৈষম্য তা-ও নাচের তালবৈষম্যের জন্য। যেখানে নাচের তাল দ্রুত সেখানে মাত্রাসংখ্যা হ্রস্ব, পর্বসংখ্যাও অনতিবিস্তর, আর যেখানে নাচের তাল বিলম্বিত সেখানে মাত্রাসংখ্যা দীর্ঘ, পর্বসংখ্যাও বিস্তারিত। বলা বাহুল্য, তালের এই তারতম্য বিষয়ভাবের প্রকৃতির উপর নির্ভর করত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাঁচালীতে মোটামুটি তিন ধরনের রচনা-অংশ ছিল : ১. বর্ণনামূলক, ২. গান, ৩. নৃত্যানুকূল গান। তবে এই তিন শ্রেণীর রচনার মধ্যে নিছক গানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং কালক্রমে পাঁচালীতে আবৃত্তিযোগ্য বর্ণনীয় রচনা ও গানযোগ্য নাচাড়িই প্রাধান্য লাভ করে। আমাদের এই অনুমানের সমর্থন পাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সোনামুখী পুথিতে (দ্র. চণ্ডীমঙ্গল : ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি)। এই পুথিতে গায়কের প্রতি এমন কতকগুলি নির্দেশসূত্র আছে যা থেকে অনুমান করা যায় চণ্ডীমঙ্গল সেকালে কীভাবে গাওয়া হত। ডঃ সেন লিখেছেন : "এই সূত্র হইল 'চালন' (বা 'চালান'), 'চৌপদি ছন্দ', 'পয়ার ছন্দ গিতে', 'ধাবাড়ি', 'ছুটা মান', 'চৌপদি তিনজনে', 'ঝাঁকা মান', 'ছুটা জাত (=জতি ?)', 'বারারি রাগ পআর ছন্দ', 'পআর ছন্দ ভূপালি রাগ', 'চৌপদি ছন্দ ভাট্যালি রাগ', 'বারমাসি ছন্দ', 'মঙ্গল রাগ সটপদি ছন্দ', 'আজিসা

কামোদ রাগ' ইত্যাদি উল্লেখ। এখানে ছন্দ কবিতার ছাঁদ (metre) নয়, গাইবার অথবা নাচের কিংবা বাজনার অথবা নাচ ও বাজনার ঢঙ বলিয়া মনে হয়। কবিকঙ্কণের মূল রচনায় এই অর্থে 'ছন্দ' শব্দটির অনেকবার প্রয়োগ আছে। যেমন, 'রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ'। পুথিতে তালের উল্লেখ নাই, আছে মানের। মুকুন্দ নিজে 'তালমান' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই 'সমস্ত' শব্দটি ভাঙ্গিয়াই 'তাল' ও 'মান' শব্দ আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অনুমান করি 'তাল' মানে ছিল আঘাত (ইংরাজী beat) আর 'মান' মানে ফাঁক (ইংরাজী bar)। 'ছুটা মান' মনে হয় ছোট অর্থাৎ দ্রুততর তাল। 'ছুটা জাত' ছোট বিরাম। 'চালন' আলস্যভরে অর্থাৎ টানিয়া টানিয়া গাওয়া"। 'ধাবাড়ি'='দ্রুত বেগে গাহিয়া যাওয়া'। 'ঝাঁপা মান'=লাফানো তাল। পআর ছন্দ—ক্ষিপ্রবেগে সুর করে পড়ার ঢঙ (পয়ার ছন্দকে কোন কোন পুরনো রচনায় 'খর্বছন্দ' বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে খর্ব=ক্ষিপ্র)। অর্থাৎ এই পুথির কোন অংশ সুরসহযোগে দ্রুত তালে আবৃত্তি করা হত, এইগুলিই 'পয়ার-প্রবন্ধ', আর কোন অংশ দীর্ঘ সময় ধরে টেনে টেনে গাওয়া হত, এইগুলিই 'দীর্ঘ ছন্দ', হয়ত আগে এই সব অংশের সঙ্গে নাচের সম্পর্ক ছিল, তাই 'নাচাড়ি'। পরে নাচের দায়িত্ব গায়েন নিজেই গ্রহণ করেছিল, সে নাচের সঙ্গে হাতের চামর ঢুলিয়ে বর্ণনীয় ভাবটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করত।

চণ্ডীমঙ্গলের সোনামুখী পুথিতে গানের যে সূত্রনির্দেশ পাওয়া যায় তা শুধু চণ্ডীমঙ্গলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, অন্য মঙ্গলকাব্য তথা পাঁচালী-জাতীয় সব রচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সোনামুখী পুথিটি ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত। কাজেই এই পুথিতে মঙ্গলগানের যে রীতিপদ্ধতির নির্দেশ পাওয়া যায় তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রচলিত রীতিপদ্ধতি বলে ধরে নেওয়া যায়। এর পর উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে দাশরথি রায় প্রমুখ পাঁচালী-কারের উদ্যোগে পাঁচালীর বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নূতনত্ব দেখা দিল। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখা গেল চিরাচরিত পৌরাণিক বিষয়বস্তু ছাড়াও সমসাময়িক সমাজপ্রসঙ্গও (যথা, বিধবাবিবাহ) গৃহীত হয়েছে, অন্যদিকে উপস্থাপনার দিক থেকে দেখা গেল: 'মূল গায়ন ভাঙা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে আখ্যাত ভাগটি আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, এবং মুখ্যতঃ ইহা

হইত নাটকীয় ভঙ্গীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর জাতীয়। গায়ন একাই বিভিন্ন পাত্রের মুখপাত্র হইতেন। কখনো টীকাটিপ্পনী করিতেন, মূল আখ্যানের ফাঁকে ফাঁকে উপাখ্যান বা রসাল প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেন। কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিতেন কৌশলে কাকু, শ্লেষ ও অর্থবহ বিশেষ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা। ছড়াকাটা হইল ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। গদ্যে ছুট কথারও ব্যবহার হইত। তারপর বিবৃতি বা কথোপকথন যখন ভাবের দিক দিয়া চরমে উপনীত হইত, তখনই তাহা গানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। মূল গায়নই সর্বদা গান গাহিতেন না, বরং গানের জন্যই অন্য সুগায়ক নির্দিষ্ট থাকিত। মূল গায়ন আবৃত্তি করিয়া, ছড়া কাটিয়া, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া আসল কাহিনীটিকে নিশ্চিত পরিণতিতে পৌছাইয়া দিতেন'।[১৪] পাঁচালীর এই উপস্থাপনাগত পরিবর্তনের কারণ পার্শ্ববর্তী অপর কতকগুলি প্রমোদ-মাধ্যমের (যথা, কবিগান, আখড়াই, তর্জা, যাত্রা প্রভৃতি) প্রভাব। অর্থাৎ মধ্যযুগের পদসংগীতের মত মধ্যযুগের পাঁচালী-গীতও কালক্রমে যুগবশবর্তী হয়ে তার ঐতিহ্যগত সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যটি বিসর্জন দিয়েছিল। তবে সাহিত্যরূপের দিক দিয়ে পাঁচালীর কাব্যরূপটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের রূপরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাব্য যদিও মধ্য-যুগের পাঁচালীর মত গেয় প্রকৃতির ছিল না, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে তার পাঠ্য-প্রকৃতি তখন প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছিল, তথাপি তার পয়ার-ত্রিপদী-স্বরবৃত্ত ছন্দের রচনাংশগুলিকে মধ্যযুগীয় পাঁচালীর পয়ার-নাচাড়ীর মত সুর-সহযোগে আবৃত্তি করা অসম্ভব ছিল না। অর্থাৎ পাঁচালীর প্রভাব তখন বাহ্যতঃ স্বীকৃত না হলেও ভেতরে ভেতরে পাঁচালীর সঙ্গে তার একটা নাড়ীর টান বজায় ছিল। সেদিক থেকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কাব্য, কারণ এই কাব্যে কবি দুই চরণের শেষে আনুপ্রাসিক মিত্রতার সহস্রাব্দপ্রাচীন ঐতিহ্য লঙ্ঘন করে যতি ও ছেদবিন্যাসের যে নতুন রীতি প্রবর্তন করলেন তাতে এই কাব্য সুরসহযোগে পাঠ করার আর উপায় রইল না। ফলে এই কাব্য হয়ে দাঁড়াল সুরবর্জিত পাঠের উপযোগী। এইখান থেকেই বাংলা কাব্যের সঙ্গে সংগীতের নিত্যসম্বন্ধের অবসান ঘটল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত বাংলা কাব্যে বিষয়গত আধুনিকতা এলেও (যথা, রঙ্গলালের কাব্য) রীতিগত মধ্যযুগীনতা অব্যাহত ছিল॥

প্রাসঙ্গিক টীকা

১. এতৈঃ সঙ্গীতবিদ্‌ভিঃ স্বরনিকরসরিৎকান্তমন্তর্বিগাহ্য
প্রোন্মীলৎসূক্ষ্মরৌঘপ্রবিততগতিকাঃ কল্পিতাঃ কেঽপি রাগাঃ।
তদ্‌গানার্থন্তু বিদ্যাপতিকবিকৃতিনা কল্পিতাস্তু ধ্রুবা যাঃ
তাসামেকোঽগ্রগাতাভবদিহ জয়তঃ সংসদি শ্রীনৃপস্য ॥

বা-সা-ই, ১ম, পূর্বার্ধ, পৃ ৩৮৯ থেকে পুনরুদ্ধৃত।

২. 'কীর্তন': খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পৃ. ৫২-৫৩।

৩. সংগীত: দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৯২১-২২।

৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড: ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৪০-৪১।

৫. এ সম্পর্কে দুটি প্রায়-সমসাময়িক সাক্ষ্য:

(ক) 'The গীত or elegiac style of writing is so very lose and arbitrary that I cannot lay down any rules for its construction': N. B. Halhed.: A Grammar of the Bengal language. P. 205. [1778 A.D.]

(খ) 'গৌড় দেশে না গীতের শৃঙ্খলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পরিপাটী উত্তম রূপে আছে': রামমোহন রায়: গৌড়ীয় ব্যাকরণ/ছন্দঃ [১৮২৬-৩৩ খ্রীঃ]।

৬. Bengali Literature in the 19th century: Dr S. K. De, 2nd Revised ed. p. 395-96

৭. মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ: ডঃ আহমদ শরীফ, পৃ. ২১৬

৮. ইসলামি বাংলা সাহিত্য: ডঃ সুকুমার সেন, ২য় সং, পৃ. ২৭।

৯. শাবিরিদ খান গ্রন্থাবলী: ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃ. ৬০।

১০. কবিকঙ্কণ চণ্ডী: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত (ক. বি.), পৃ. ৪৪।

১১. কবি আলাওল বিরচিত তোহফা: গোলাম সামদানী কোরায়শী-সম্পাদিত, পৃ. ৪৮।

১২. শাবিরিদ খান গ্রন্থাবলী: ডঃ আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃ. ৮।

১৩. The Sanskrit Drama.: A. Berriedale Keith, p. 52-53.

১৪. দাশরথি ও তাহার পাঁচালী: ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৬৪-৬৫।

রূপরাম চক্রবর্তী-রচিত

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি পালার পুথি

'ইছায়ের পালা'

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের আনুকূল্যে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জন্য একটি পুথিশালা স্থাপনে প্রয়াসী হই, তখন আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র রায় তার নিজের বাসভূমি বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রাম থেকে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ করে আনে। আলোচ্য পুথিটি সেই সংগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত। পুথিশালার মুদ্রিত তালিকা অনুসারে পুথিটির ক্রমিক সংখ্যা ১৫ (দ্রঃ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র , পৃঃ ৯২)।

পুথিটি হাতে তৈরি কাগজে লেখা, কিছু কাগজ ভাঁজ-করা, কিছু নি-ভাঁজ। পুথির মাঝামাঝি জায়গায় বন্ধনসূত্রের জন্য বর্গাকৃতি জায়গা ফাঁকা থাকলেও সেখানে কোন ছিদ্র নেই। পুথি কালো কালিতে লেখা, অক্ষর উজ্জ্বল, তবে স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। পুথির আকৃতি ৩৪ সে. মি.× ১০ সে. মি. (১৩½"× ৪½")।

পুথিটিতে মোট ১৭টি পাতা আছে। ১নং পাতা ও ১৭নং পাতায় মাত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা আছে, বাকী পাতাগুলির উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা (এখানে উভয় পৃষ্ঠার মধ্যে সম্মুখ পৃষ্ঠাকে ২।ক, ৩।ক ইত্যাদি এবং পশ্চাৎ পৃষ্ঠাকে ২।খ, ৩।খ ইত্যাদি ক্রমে নির্দেশ করা হলো)। প্রতি পাতার কয়েকটি চরণ খুব কাছাকাছি লিখে তারপর এক লাইন ফাঁক দিয়ে আবার কয়েক লাইন কাছাকাছি করে লেখা হয়েছে, ফাঁক দেবার উদ্দেশ্য হয়ত সম্ভাব্য সংশোধন ও তোলা পাঠের জন্য জায়গা রাখা। সন্নিহিত চরণগুলির পারম্পর্য অনুসারে প্রতি পৃষ্ঠার চরণসংখ্যার হিসাব নিম্নরূপ :

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা
১	৩+৩+৩=৯ [অর্থাৎ প্রতি ৩ লাইন অন্তর একটু ফাঁক]।
২।ক,-খ	৩+৩+৩=৯
৩।ক,-খ	৩+৩+৩=৯

পৃষ্ঠা	চরণসংখ্যা
৪।ক	৩+৪+৩=১০
৪।খ	৩+৩+৩=৯
৫।ক	৩+৩+৩=৯
৫।খ	৩+৪+৩=১০
৬।ক,-খ	৩+৩+৩=৯
৭।ক,-খ	৩+৩+৩=৯
৮।ক,-খ	৩+৩+৩=৯
৯-১৬।ক,-খ	৩+৪+৩=১০
১৭	৩+৩+২=৮

পুথির ১নং পাতাটি মাঝ বরাবর ছিন্ন, পাতার বামার্ধ আমাদের হস্তগত, দক্ষিণার্ধ অবলুপ্ত।

পুষ্পিকা অনুসারে পুথির লিপিকাল 'সন ১০৩৯ সাল তাং ১ পোষ'। সন ১০৩৯ সালকে বঙ্গাব্দ ধরলে খ্রীস্টাব্দ হয় ১৬৩২, কিন্তু পুথির প্রাপ্তিস্থান মল্লভূমি বাঁকুড়া হওয়ায় ঐ সাল মল্লাব্দ কিনা তা বিবেচনা করতে হয়। ঐ সাল মল্লাব্দ হলে খ্রীস্টাব্দ হয় ১৭৩৫। তবে লিপির ছাঁদ, কাগজের জীর্ণতা ও পুথির ভাষাগত বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় পুথিটি সপ্তদশ শতকে লিখিত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। পুষ্পিকা থেকে পুথি সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য জানা যায়: পুথির লিপিকরের নাম শ্রীপরুসরাম (পরশুরাম না পুরুষরাম?) ঘোষ। লিপিকরই সম্ভবতঃ পুথিটির মালিক। তিনি 'নিমু কলু' নামক কোন ব্যক্তিকে দুই আনার বিনিময়ে পুথিটি 'পঠন করিতে' দিয়েছিলেন। দুই আনা পুথির ভাড়া বা মূল্য হতে পারে।

লিপির দিক থেকে পুথিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: (১) ঈ ও ঈ-কারের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, হ্রস্ব-দীর্ঘ-নির্বিশেষে ই-ধ্বনির জন্য সর্বত্র হ্রস্ব ই ও ই-কারের ব্যবহার; (২) পুথিতে উ হরফটি নেই, তৎপরিবর্তে সর্বত্র উ হরফটি ব্যবহৃত, অন্যদিকে উ-কার কোথাও নেই (কেবল 'ন্ন' ছাড়া), হ্রস্ব-দীর্ঘ-নির্বিশেষে সর্বত্র উ-কার ব্যবহৃত; (৩) উ-কারের লিপিবৈচিত্র্য: (ক) ৣ, (খ) ৩, (গ) বর্ণভেদে চিহ্নভেদ, যেমন: প্+উ='পু', দ্+উ='দু', ল্+উ=লু, হ্+উ='হু', ন্+উ='নু', জ্+উ='জু', ত্+উ='তু'

ক্‌+উ='ঙ্গ', ভ্‌+উ='ভ্র', ম্‌+উ=ক্ষ। তবে কয়েক জায়গায় আধুনিক ধরনের ক্‌+উ='কু' ও ন্‌+উ='নু', ল্‌+উ='লু' হরফও আছে—এ থেকে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক পুথিটি এক হাতে লেখা কিনা। কিন্তু একই পঙ্‌ক্তিতে (যেমন ১৫।ক পৃষ্ঠায়) প্রাচীন 'ঙ্গ' ও অর্বাচীন 'কু' হরফ লিখিত হওয়ায় মনে হয় পুথির লিপিকর দুই ব্যক্তি নন, একই ব্যক্তি : তবে তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি প্রাচীন ও নব্য দুই রীতির সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। এই পুথি যখন লিখিত হয় তখন লিপিকর্মের ক্ষেত্রে দ্রুতলিখনের প্রয়োজনে হয়ত পুরনো রীতির পাশাপাশি নতুন রীতির সূচনা হচ্ছিল। এই পুথির লিপিকর হয়ত নতুন রীতিকেও বরণ করতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। (৪) 'জ্ঞ'-এর জন্য সর্বত্র 'ঙ্গ'। যেমন, অজ্ঞান=পুথির বানান 'অঙ্গান'। (৫) ন, ণ, ল='ন'। লিপিকর্ম সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন জাগে : পুথির কয়েকটি জায়গায় ও-কার >উ-কার, যেমন, জ্যোতি>'জুতি' (২।খ), যোগ্য>'জুজ্ঞ' (৪।খ) উনকোটি >'উনকুটি' (৬।ক) এবং শোণিত>'সুনিত' (১২।ক, ১৩।ক)। এছাড়া, পুথিতে নাসিক্যযুক্ত 'ঢেঁকুর' ও নাসিক্যহীন 'ঢেকুর' এবং 'কাঁপে' ও 'কাপে' দুই বানানই পাওয়া যায়। ও-কারের উ-কারীভবন এবং স্থানে স্থানে নাসিক্যহীনতা থেকে সংশয় জাগে লিপিকর লিপিকর্মের সময় মাঝে মাঝে কোন পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তির কাছে শ্রুতিলিখন নিয়েছিলেন কি না। কারণ এই ধরনের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের উপভাষাতেই বহুব্যাপক। আমাদের অনুমান সত্য হলে বুঝতে হবে লিপিকর মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছেন, সব সময় নয়, কারণ পুথির সর্বত্র ও-কারের উ-কারীভবন ও ধ্বনিবিশেষের নাসিক্য-হীনতা নেই, অথবা এমন হতে পারে যে যিনি লিপিকরকে শ্রুতিলিখনে সাহায্য করেছিলেন তিনি দীর্ঘকাল রাঢ়ে বসবাস করায় রাঢ়ী ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আয়ত্ত-করেছেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় ধ্বনি-সংস্কার একেবারে বর্জন করতে পারেন নি।

ভাষার দিক থেকে সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অপিনিহিতির আভাস : পরিপুর্ণ কৈল্য ঘরভরা। ঢেকুরের গড় হইল্য সত্যের সিউলি, সুমুখে ধর‍্যাছে কেহ পুজার পদ্ধতি, লঙ্কার ভিতর জেন সাজ্যাছে রাবন; ইয়া-অন্ত অসমাপিকার পদের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে য্যা-অন্ত রূপ পাওয়া যায় : ইস্বরি সুনিল বস্যা দেউল ভিতরে (৮।ক); এহা দেখ্যা দেবতা সকল হাস্যা মৈল্য (১২।খ)। ৭।ক পৃষ্ঠার একটি পঙ্‌ক্তিতে অসমাপিকা ক্রিয়া 'করি'

(<করিয়া) কেটে 'কর‍্যা' করা হয়েছে ['কাগজ হিসাব কর‍্যা ঢেকুরের কর নিব']। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপে :

প্রথম পুরুষ ক্রিয়াবিভক্তি : -ইব,-ব :

সেই রূপ **হব** গিত পদের গাঁথনি।
ইছাই নিধনে ধর্ম **পাব** পুষ্পপানি।
স্থনিত বাঁধিয়া দেবি **করিব** ভক্ষণ।
ইছাই **মরিব** রনে আমি নাহি জানি।
দেবতা তোমার ঘরে নাঞি **খাব** জল।

মধ্যম পুরুষ ক্রিয়াবিভক্তি : -ইবে, -ইবি

তিন বিরে নিধন **করিবে** তিন সরে।
কার বোলে **হারাইবে** বিফল পরানি।
উচিত বলিতে গালি **দিবে** মহাশয়।
মরনের ডরে পারা **করিবি** পিরিত (৭।ক)।

উত্তম পুরুষ ক্রিয়াবিভক্তি : -ইব

আমি আগে **সাধিব** ইছাইয়ের সনে রণ।
রাজটিকা আপনি কপালে তোর **দিব**।
কাগজ হিসাব কর‍্যা ঢেকুরের কর **নিব**॥

[একটি মাত্র বাক্যে -ইব-র বদলে 'মু' বিভক্তি আছে :
'আজি রনে আপনি ধরিমু খড়্গঢাল' (৩।খ)।
লক্ষণীয়, উত্তম পুরুষ ভবিষ্যতে 'মু' বিভক্তি
পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, এখানে
লিপিকর্মের শ্রুতিলিখন সম্পর্কে আমাদের
পূর্বোক্ত অনুমানের সমর্থন মেলে।]

সহার্থক অনুসর্গ 'সঙ্গতি' : রাখাল সঙ্গতি রনে বড় লজ্জা পাবে (৫।ক),
পদ্মার সঙ্গতি ছিল গঙ্গার জিবন (১৬।খ)।

অপাদান অনুসর্গ -এ হৈতে : হাথে হৈতে সর্ব্বজয়া উরিলা গগনে (২।ক)
ছুয়ে হৈতে ভাল স্থনি (২।খ)।

পুথিতে ভণিতায় সর্বত্র দ্বিজ রূপরামের নাম আছে। ভণিতাগুলি নিম্নরূপ :

দ্বিজ রূপরাম গান ধর্মের সংঙ্গিত—২ বার।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল—৩ বার।

দ্বিজ রূপরাম গান অনাদ্যের বরে—১ বার।
দ্বিজ রূপরাম গান সখা নিরঞ্জন—১ বার।
অপরূপ সঙ্গিত রচিল রূপরাম—১ বার।
ধর্ম্মের মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়—১ বার।
অনাদি মঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়—২ বার।
দ্বিজ রূপরাম রসগান —১ বার।
রূপরাম গান গিত —১ বার।

তবে এখানে দুটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার: (১) পুথির প্রথম পাতায় দ্বিজ রূপরাম ছাড়াও আর একটি নাম পাওয়া যায়—দ্বিজ. ধর্মদাস। ইনি সম্ভবত: রূপরামের কাব্যের গায়েন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডঃ সুকুমার সেন ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য উভয়েই ধর্মদাস নামে এক ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা গায়কের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁদের উল্লিখিত ধর্মদাস বৈদ্য, পক্ষান্তরে এই পুথির ধর্মদাস 'দ্বিজ'। আমাদের পুথির ধর্মদাস কি তবে ভিন্ন ব্যক্তি? (২) ৩াক পৃষ্ঠায় 'ঢেঁকুর দক্ষিণে সেন করিল মোকাম'—এই পঙ্‌ক্তি দিয়ে যে স্তবক শুরু হয়েছে, তাকে ১ সংখ্যায় ও তার পর থেকে প্রত্যেকটি স্তবককে ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ১ ও ২ পাতার স্তবকগুলিতে কোন ক্রমিক সংখ্যা নেই। এই অসংখ্যাত স্তবকগুলির একটিতেই দ্বিজ ধর্মদাসের নাম পাই। অন্যদিকে, ক. বি. ৩৯৬৮ নং পুথি যে পঙ্‌ক্তি দিয়ে শুরু হচ্ছে ['ঢেকুর দক্ষিণ গড়ে করিল মোকাম'] তার সঙ্গে আমাদের পুথির প্রথম সংখ্যাত স্তবকটির প্রথম পঙ্‌ক্তির মিল আছে ['ঢেঁকুর দক্ষিণে সেন করিল মোকাম']। তাহলে এই অনুমানই কি সংগত যে, পুথিতে প্রথম সংখ্যাত স্তবক থেকে যে অংশ পাওয়া যায় তা-ই রূপরামের মূল রচনা, তার পূর্ববর্তী অংশ স্থানে স্থানে রূপরামের নামাঙ্কিত হলেও আসলে তা গায়েনের দ্বারা রচিত?

পরিশেষে আর একটি কথা বলা দরকার। এখানের ইছায়ের পালা যে প্রকাশ করা হলো তার উদ্দেশ্য এই পালার পাঠ-সংশোধন, পুনর্গঠন ও সম্পাদনা করে একটি আদর্শ পাঠ তৈরি করা নয়, এর মুখ্য উদ্দেশ্য এই পুথিটির পাঠই সুধী-সমাজের কাছে উপস্থাপিত করা। লিপিকালের দিক থেকে আমাদের এই পুথিটি রূপরামের কাব্যের প্রাচীনতর পুথিগুলির অন্যতম।

ক.বি. পুথির (৩৬৯৮) লিপিকাল 'সন ১২২৭ সাল তারিখ ২২ আসাড় বার মঙ্গলবার', বিশ্বভারতীর ইছাই বধ পালার লিপিকাল ১১৩৮ বঙ্গাব্দ, আর আমাদের পুথির লিপিকাল 'সন ১০৩৯ সাল তাং ১ পোষ'। কাজেই প্রাচীনতার দিক থেকে আমাদের পুথির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যিনি এই কাব্যের আদর্শ পাঠ সন্ধান করবেন, তুলনা (colla.ion)র জন্য আমাদের এই পুথির পাঠ তাঁর কাছে একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে পুথির পাঠের কোন রকম পরিবর্তন বা পরিবর্জন না করে প্রায় 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' সূত্রানুসারে পুথিটির মুদ্রিত অনুলিপি প্রকাশ করা হলো। কেবল পুথির যে সব জায়গার লিপি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, সেই সব জায়গার পাঠপূরণের জন্য স্থানে স্থানে ক.বি. পুথির পাঠের তুলনা করা হয়েছে, এই তুলনা অবশ্যই চূড়ান্ত নয়। ক.বি. পুথি ছাড়াও আর দুটি পুথির পরোক্ষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে—এই দুটি পুথি বিশ্বভারতী পুথিশালায় রক্ষিত, সংখ্যা ৮৮০ এবং ১৪৪৭। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের 'পুঁথি পরিচয়' গ্রন্থের ২য় ও ৩য় খণ্ডে এই দুটি পুথির অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে। আমাদের পুথির প্রথম পাতার সঙ্গে বি-ভা পুথির উদ্ধৃত অংশের সাদৃশ্য থাকায় আমাদের পুথির ছিন্ন ও লুপ্ত দক্ষিণার্ধের পাঠপূরণের জন্য ১৪৪৭ নং বি. ভা. পুথির গৃহীত পাঠ বন্ধনী [ ]র মধ্যে রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থাও চূড়ান্ত নয়, এই পালার আদর্শ পাঠ ঠিক করতে হলে আরও পুথির সঙ্গে তুলনা করা দরকার। এবং এ কাজে শুধু রূপরামের পুথিই নয়, মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলের পুথিও অনেকখানি সাহায্য করবে বলে মনে হয়, কারণ আমাদের পুথির কোন কোন পঙ্‌ক্তি ক. বি.-প্রকাশিত মাণিকরামের ধর্মমঙ্গলকাব্যের রচনাংশের অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়। হয়ত রূপরামের জনপ্রিয়তাই মাণিকরামের গায়েনকে রূপরামের রচনাংশ মাণিকরামের রচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে অনুপ্রেরিত করেছে। কাজেই মাণিকরামের কাব্যের পুথির সঙ্গে তুলনা করলেও হয়ত রূপরামের রচনার অনেক লুপ্ত বা দুর্বোধ্য অংশের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

[১] দ্বিজ রামকৃষ্ণ ॥

জয় পদ জুগে·করি নতি বন্ধো দেব গনপ [তি]
[এক দন্ত কুঞ্জর কোমলে ।][১]
[অতি মনোহর তনু] [জিনি প্রভা] তের ভানু
পুর্ব্বপুরি[২] মটুক মণ্ডলে ॥
[৩]সদা পুচ্ছ´ ব্রত[৩] সাস্তি [নখ রুচিত[৪] কান্তি
[৫]না জানি কলঙ্ক দ্বিজরাজ ।[৫]
মহা মহা জোগি] জত সেবে জারে অভিরত
আগে পুজে দেবতা সমাজ[৬] ॥
[জোগ ধ্যান নিরবধি অশেষ গুনের নিধী
নিরন্তর মুসক উপরে ।][৭]
[৮]এক ধ্যান পরাজিত নহে কভু কদাচিত
স্বঙরিলে বিসম [বিঘ্নি হরে ॥][৮]
[[৯]রাতুল[৯] চরণ রাজে [১০]সোনার[১০] নপুর বাজে
কিঙ্কিনী [১১]বলয়া বি] ভুসিত ।[১১]
তরণি সরণি দাম প্রকাসিত মনিরাম
মধুলোভে [অলি গায় গিত ॥][১২]
[বন্দ দেব গৌরির নন্দন ।][১৩]
[ ][১৪] বিঘ্ন কর নাস
তুয়া পদে করিমু বন্ধন ॥

দ্বিজ ধর্মদাসে গা[১৫][য় দয়া কর গনরায়
নাএকের করিবে কল্যান।][১৫]

[ ][১৬] বিনে অভিরত করি মনে
দ্বিজ রূপরাম রসগান ॥ '.' ॥

কোথা [১৭][আছ জঅ দুর্গা এ মের মন্দনে।
দণ্ড চারি উর দুর্গা সেবক স্বোঙরনে ॥

না][১৭] জানিলাঙ ক্ষেন[১৮] মন্ত্র না জানিলাঙ[১৯] বেলা।
[২০]ধর্মের সংঙ্গীতে গো আ [ ] ॥[২০]

[২১][তোমা স্বোঙরিএ গো মন্দিরে দিলাম ঘা।
পুত্রভাবে উরি][২১]বে গায়নের গুরু মা ॥

অসুর বধিতে গেলে হিমালয় গিরি।
[২২][বান রাজা বধিয়া বলালে দিগাম্বরি ॥

অসুর বধিতে গেলে অসুভ সংঙ্ক][২২] [২াক] রা।
মহিসাসুর বধিয়া গলায়ে মুণ্ডমালা ॥

জে কালে জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকিউদরে।
তার পক্ষ্যা হইয়া জন্ম নিলে গোপঘরে ॥
কে বুঝিতে পারে এত তোমার মহিমা
শ্রীহরি করিবে পার প্রলয় জমুনা ॥
তোমা বধিবারে কংস ধরিল চরনে।
হাথে হইতে সর্ব্বজয়া উরিলা গগনে ॥
গগনে উরিয়া গো হইলে অষ্টভুজা।
বিধিবিষ্ণু সঙ্কর তোমার করে পূজা ॥
মদন অসুরে গো জখন হইল রন।
কাতর হইল কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥

১৫. বি-ভা (৮৮০) ১৬. এই অংশের সঙ্গে সংগতিশীল কোন পাঠ 'পুঁথিপরিচয়ে' নেই।
১৭-১৭ বি-ভা (৮৮০), ১৮ ধ্যেন (বি-ভা ৮৮০)। ১৯ পুথিতে 'জানিঙ', বোধহয় 'লা' ছাড় পড়েছে। ২০-২০ তোমার সোঙর দুর্গা লইলাম ছাদলা (বি-ভা ৮৮০)। ২১-২১ বি-ভা (৮৮০)। ২২-২২ বি-ভা (৮৮০)। বি-ভা পুথিতে অবশ্য 'অসুভ সংঙ্কলা' পাঠ আছে।

নারদের উপদেসে সেবিয়া মঙ্গলা।
একদণ্ড উর দেবি সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ঘটে ভর কর গো ছাড়িয়া দেহ গলা।
একদণ্ড তেজ গো হরের বাসঘর।
আসরে স্থওরণ করে কাত[২৩] কিঙ্কর ॥
গায়েন নই [গুনিন][২৪] নহি গায়েনর পো।
তোমার মায়া গো গিতের মায়া মো ॥
কত কত গুনি আছে আমি কোন ছার।
খিরদের তিরে জেন ঘোলের পসার ॥
জালিয়ার জালে ছাঁকিয়া তুলে পানি।
সেইরূপ হব গিত পদের গাঁথনি ॥
নিরঞ্জনের মায়া কহনে নাহি জায়।
নিরঞ্জনের আঙ্গায়[২৫] দ্বিজরূপরাম গায় ॥

কাতর কিঙ্কর ডরে আসরে স্থওরন করে
তেজ ধর্ম কৈলাসসিখর।
বিলম্বন দণ্ড কত দেখ নাট স্থন গিত
আপনি আসরে কর ভর ॥
মজিনু বিদ্যার রসে পড়ি স্থনি নানা দেসে
[নাই জানি গিতে]র[২৬] [২াখ] স্থরনি।
আপনি করিলে দয়া দিলে ধর্মপদছায়া
আমি মুর্খ কি বলিতে জানি ॥
এক ব্রহ্ম সোনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নির্ণম করিতে কিছু নাঞি।
কিবা রূপগুন কথা হরিহর ইন্দ্র দাতা
জত কিছু আপনি গোসাঞি ॥

২৩. 'কাতর' ?
২৪. লিপি অত্যন্ত অস্পষ্ট, বন্ধনীতে বিশ্বভারতী ৮৮০ নং পুথির পাঠ।
২৫. =আজ্ঞায়।
২৬. লিপি অস্পষ্ট, বন্ধনীতে বিশ্বভারতী (৮৮০) পুথির পাঠ।

ধবল গায়ের জুতি ধবল আসনে স্থিতি
ধবল বরনে বাড্ডিঘর।
ধবল বরন সোভা অনুপাম মনিলোভা
আল করে পরমসুন্দর।
কে জানে তোমার খেদ ব্রহ্মসোনাতন বেদ
পাণ্ডব বংসের চূড়ামনি।
তুমি জল তুমি স্থল বিপরিত বুদ্ধিবল
জোগরূপে জর্মিলা আপনি॥
একরূপ নানা ঠাঞি নির্ম্ম করিতে নাঞি
জাজপুর আছ্যের দেহারা।
দেবতা অসুর ন [র][২৭] সভে হয়্যা সতন্তর
পরিপুর্ন্ন কৈল্য ঘরভরা॥
বল্লুকানদির তিরে দেবতা অসুর নরে
চারি পণ্ডিত পুজে নিরঞ্জন।
ঘন পড়ে সঙ্খধ্বনি দুরে হইতে ভাল সুনি
উলসিত সকল ভুবন॥
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করিল পুজা
পুত্র কাট্যা দিল বলিদান।
মদনা তাহার রানি চক্ষে না পড়িল পানি
আত্মপুজা দিল সাবধান॥
বিসম ধর্ম্মের ঘর দেখ্যা বড় লাগে ডর
একমন হইলে হয় পার।
দুমন করিলে জদি তারে বিড়ম্বিল বিধি
আচম্বিতে পড়ে মহামার॥
উর ২ ধর্মরাজ পরিপুর্ন কর কাজ
দান [৩াক] পতি আছে মুখ চায়্যা।
মনে বড় করি ভয় না জানি কেমন হয়
[পার][২৮] কর আপনি আসিয়া॥

২৭. 'র' পুথিতে ছাড় পড়েছে।
২৮. লিপি অস্পষ্ট। বন্ধনীতে বিশ্বভারতী ৮৮০ নং পুথির পাঠ।

আমি দ্বিজ অল্পঙ্গানি[২৯] ভালমন্দ নাঞি জানি
দোসগুন সকলি তোমার।
রূপরাম গান গিত ধর্ম্ম হইলেন হরসিত
পথে দেখা দিল করতার॥

ঢেঁকুর দক্ষিণে সেন করিল মোকাম।
লঙ্কার উপর জেন বসে রঘুরাম॥
জোড়া সিংহাসারে কালু সর্দ্দ জায় দুর।
চমক পড়িল রাজ্য অজয় ঢেঁকুর॥
ঢেঁকুরের গড় হইল্য সতের সিউলি।
ইছাই ঘোষ গোয়ালা পুজেন ভদ্রকালি॥
ঢাকঢোলসিংঙ্গাকাড়া একাকারময়।
নানা বর্ন্নে বাদ্য বাজে দেবির আলয়॥
বিনা বাঁসি মালদ[৩০] মন্দিরা করতাল।
ভারথ কমল মুনি জয়থর সাল॥[৩১]
বায়ে বাজে আপনি দক্ষিনাবৃত সঙ্খ।
সপ্ত সরাঙ্গতি বাজয়ে নানারঙ্গ॥
কুলিন পণ্ডিত কবি পড়ে সপ্তসতি।
সুমুখে ধর্‌য়্যাছে কেহ পুজার পর্দ্ধতি॥
ধুপধুনাপরিপাটি ঘোর অন্ধকার।
আতপ তণ্ডুল চিনি বিসাসয়[৩২] ভার॥
কস্তুরি চন্দন চুয়া সতদলমুনি।
ইছাই ঘোষ দেবিপূজা করেন আপনি॥
সজল চন্দনচুয়া চামরের বা।
ভগবতি বাসুলি রঙ্কিনি উর মা॥

২৯. =অল্পজ্ঞানী

৩০. =মাদল (বর্ণবিপর্যয়)

৩১. পাঠ সংশয়িত, অর্থ দুর্বোধ্য। ক.বি. (৩৬৯৮) পুথিতে এখানে আছে 'মুনি সব ভারথ কহিছে সুরসাল।'

৩২. পুথিতে 'সসায়' লিখে 'সা'-র উপরে 'বি' লিখে লিপিসংশোধন করা হয়েছে

আসি মসি বলিদান সতেক ছাগল।
রুধির[৩৩] অবনি হইল সাক্ষাত কমল॥
মহাবিদ্যা জপ করে উপরি জরুড়।
জাহা হইতে বিষ্ণুভক্তি পাইল্য গরুড়॥
মন্ত্রের অধিন বটে সকল দেবতা।
স্তুওর [তাখ] ন করিতে দেবি হইল উপানিতা
রূপের প্রতাপে পুন পড়িছে বিজুলি।
স্তব করে ইছাই সমুখে কৃতাঞ্জলি॥
চামুণ্ডা চণ্ডিকা মুণ্ডা মথনের কালে।
নিমুণ্ডামালিনি রূপা হইল বনস্থলে॥
দুর্গতিনাসিনি দুর্গা অন্য নাঞি ইথে।
বিপত্যনাসিনি নারায়নি নমস্ততে॥
লোচনজুগলে ধারা ধুলায়ে ধুসর।
ইশ্বরি বলেন স্থন ইছাইকুওর॥
ব্রহ্মার সমান স্থনি মনহর স্তব।
কার সনে জুর্দ্ধে কোথা পাইলে পরাভব॥
দেবির বচন স্থনি বলে ইছাই ঘোষ।
তোমা দরসন মনে পাইল পরিতোষ॥
মহাবির লাউসেন ধর্ম্ম অবতার।
বাজিবর বিমানে অজয়া হৈল্য পার॥
পড়িল প্রথম রনে লোহাটা বর্জ্জর।
বলবন্ত লাউসেন বিজঅ ধনুর্দ্ধর॥
তরাসে চঞ্চল তনু করে টলবল।
নাম স্থনি এখনি অঙ্গের টুটে বল॥
এত স্থনি সর্ব্বজয়া বলেন তুরিত।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের সংঙ্গিত॥* ॥১॥
ইশ্বরি বলেন ইছাই মনকথা নাই।
অর্জ্জুন সারথি ধর্ম্ম কি ধরে বড়াই॥

---

৩৩. 'রুধিরে'?

বরুন বিধাতা হরি হরু পঞ্চানন।
কেবা আছে আমার সমুখে দেই রন ॥
আজি রনে আপনি ধরিমু খড়্গঢাল।
কি করিতে পারে তোর অষ্ট দিগপাল ॥
বলিতে বলিতে জেন খসে তিন বান।
অসুর দেবতা দেখি হইল কম্পমান ॥
তিন সর দিল দেবি ইছাই করে।
তিন বিরি নিধন করিবে তিন সরে ॥
বির কালু লাউসেন অগুিল পাথর।
এই তিন বানে তারা জাবেক জমঘর ॥
এই কথা ইছাই [৪।ক] বলিল তোর তরে।
সর্ত্তরে সমরে চল অজয়ঢেঁকুরে ॥
হেট মুখে স্থনে[৩৪] ইছাই এই কথা স্থনি।
লোচনজুগলে ধারা বহে মন্দাকিনি ॥
রামা বলে স্থনি তোমার বিপর্য্যিঅ মায়া।
তবে কেন দসাননে তুর কৈলে দয়া ॥
দস মুণ্ড কাটিয়া তোমার সেবা নিল।[৩৫]
রাম অবতার কালে সবংসে মজিল ॥
এত স্থনি ইস্বরি বলেন হেটমুখে।
রাবন রাজার সোক আছে মোর বুকে ॥
দৈইব জখন ধরে ইছাই হয় সর্ব্বনাস।
রামচন্দ্র গুননিধি গেলা বনবাস ॥
বাঁধা গেল সাগর রাবন কেন মরে।
সর্ব্বনাস হয় ইছাই দৈব জখন ধরে ॥
উচিত বলিতে মনে সভাকার তুখ।
বিসুই সম্পদ জত জলের বিম্বুক ॥

৩৪. লিপিবিভ্র, এখানে অন্য কোন ক্রিয়াপদ বসাই সঙ্গত,
ক.বি. পুথিতে আছে 'হেট মুখে কান্দে ইছা এই বাক্য শুনি'।

৩৫. 'দিল' হওয়া সম্ভব, তুলনীয় ক.বি. পুথি 'দস মুণ্ড কাটিয়া তোমার পূজা দিল'।

সাজ কর সমর সর্ত্তরে চল জাই।
বিলম্বে নাঞিক কার্য্য সুনরে ইছাই ॥

এত সুনি মহাবির সর্ত্তরে সাজন।
লঙ্কার ভিতরে জেন সাজ্যাছে রাবন ॥

পাতালে বাসুকি কাঁপে স্বর্গে মঘবান।
অষ্ট দিগপাল দেখি চঞ্চল পরান ॥

সিরে বাঁন্ধে পাগড়ি পচুড়া[৩৬] পদ্মফুল।
তার উপরে বন্ধন অন্ধন অনুকুল ॥

দুথরি পটুকা বান্ধে রাধা রাম কুনি।
দফ দফ জলে তাথে অজগর মনি ॥

অঙ্গে পরে ইছাই অপুর্ব্ব অভরন।
নিলমনি সোভা করে কস্তুরি চন্দন ॥
সর্ব্ব অঙ্গে পরিল কবজ আর রাঙ্গি।
কমর কসিল দঢ় জমধর টাঙ্গি ॥
বান্ধিল জুগল অসি মুখে জার কাল।
নৌতন জলধরুচি নিদারুন ঢাল ॥
জুগল তরকচ বান্ধে বাইস হাজার তীর।
মেঘনাদ সদ্রস[৩৭] সুখি মহাবির ॥
অবনি চঞ্চল হইল ধরিতে ধনুক।
অসুর পালায় ডরে অমর ভুবুক[৩৮] ॥
তরনি দুফর বেলা বিমানে মোহিত।
[৩৯]সন্ধ্যায় সর [৪।খ] নিহাড়া হইল আচম্বিত ॥[৩৯]
ইছাই করিল জাত্রা ইশ্বরি ধিয়ান।
মার ২ বল্যা বির সুভক্ষনে জান ॥

৩৬. পাঠ সংশয়িত, লিপি অস্পষ্ট ; ক.বি. পুথিতে 'জেন'।
৩৭. ='সদৃশ' (?) ; ক.বি. পুথিতে 'মেঘনাদ সমান কি জানি মহাবির'।
৩৮. ='ভূভুক্'=রাজা ; অমরভূভুক্=দেবরাজ।
৩৯. পাঠ সংশয়িত, ক.বি. পুথি 'সন্ধ্যার তরনি হারা হল্য আচম্বিত'।

উরে[৪০] কাঁপে জগত জিবন সদাগতি।
ঢেঁকুর দক্ষিনগঢ়ে হইল উপনিতি॥
মহি আর আকাস পাতাল চমৎকার।
ইন্দ্র বলে ইছাই অপুর্ব্ব অবতার॥
জেইখানে আছেন ময়নার নৃপবর।
সেইখানে উত্তরিলা ইছাই কোঙর॥
দুই বিরে সাজিল অনন্ত অনুপাম।
ইছাই হইল রাবন লাউসেন হইল রাম॥
লাউসেন বলে স্তন ইছাই গোয়ালা।
ধন্য সখা সামরূপা সর্ব্বমঙ্গলা॥
লাউসেন বলে স্তন কালুসিংহ ভাই।
ঢেকুরের জুঙ্গ[৪১] রাজা দেখিল ইছাই॥
অমরাবতির রাজা জেন পুরন্দর।
রাজা দুর্জ্জোধন কিবা হস্তিনানগর॥
দারুন জমের বেটা জেন বলবান।
নিপাত কবজস্তত না দেখি সমান॥
দুর্ব্বার তনয় কিবা অকাল পাবক।
কিবা জানি অবতির্ন অস্থরতারক॥
তথাপি তাহারে দেখি অঙ্গের টুটে বল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল॥*॥২॥
বির কালু বলে স্তন ময়নার রাজা।
ইছায়ের সারথি আপনি দশভুজা॥
আমি আগে সাধিব ইছায়ের সনে রন।
বলবন্ত দেখি বির সাক্ষাতে হুতাসন॥
তবে জদি পরিনামে মাগে পরাজয়।
প্রিত করাা দেসে জাব স্তন মহাসয়॥

৪০. =ডরে (?) ; অথবা 'উরে'=উরঃ স্থলে=বুকে (?), ক.বি. পুথি 'ডাকে'
৪১. =যোগ্য, ক. বি. পুথি 'জোগ্য'।

সাধুসঙ্গে মিলন অনেক ভাগ্যে পাই।
পরিনাম নিশ্চয় জানিতে আ [•াক] মি জাই।
আমি সখা থাকিতে আপনি রনে জাবে।
রাখাল সঙ্গতি রনে বড় লজ্জা পাবে॥
কি জানি গোয়ালা জাতি বলে কুবচন।
জাতের সভাব দুর না জায়[৪২] খগুঃ ॥[৪২]
সময়ে দেখিলে রাজা বিসম বিক্রম।
কোন ছার সমরে আপনি পাবে শ্রম॥
বৃসকেতু মহাবির জানে সর্ব্বলোকে।
কোন কর্ম না করিল অর্জ্জুন সমুকে॥
খাণ্ডা ফলা আপনি দুহাথে সরাসন।
ইছাই বিরে সমুখে দিলেন দরসন॥
দেউল দেখিল দুরে দেবিকে প্রনাম।
ইছাই দেখিয়া বির বলে রাম ২॥
সবিনয় বির কালু বলেন তখন।
সুন বাপু ইছাই ঘোষ আমার বচন॥
আমি নহি বিপক্ষ তোমার অনুকুল।
তোমার বিত্তান্ত বাপু জানি আগু মুল॥
তুমি আমার গ্রামের সমন্ধে ভাইপো।
দরসনে বিস্তর লাগিল মায়ামো॥
মনে নাহি কল্পনা[৪৩] অতেব কহি হিত।
লাউসেন রাজার সহিত করহ পিরিত॥
পরাজয় মাগ্যা লেহ লাউসেনের পায়।
নহে তোমার সম্পদ রাজতি পুন জায়॥
ঠাকুর হইলে বাড়ে বড়ই জঞ্জাল।
কর দিয়া ঠাকুরালি কর সর্ব্বকাল॥

---

৪২. পুথিতে 'না জায়কথন' লিখে পরে 'ন' কেটে সেখানে 'গুন' লেখা হয়েছে। ওদিকে ক.বি. পুথিতে 'জগতের (জাতের ?) সমান দোষ না ছাড়ে কথন'। অনুমান করি এই অংশের আর একটি পাঠ এই রকম ছিল: 'জাতের সভাবদোশ না জায় কথন'।

৪৩. =চিন্তা

এত সুনি কম্পিত ইছাই ঘোষ বলে।
নিকুম্ভিলা জঙ্গের আগুন জেন জলে ॥
ঢেকুরে বিষ্ণুর কভু নাহি অধিকার।
আমার সমুখেতে লাউসেন কোন ছার ॥
দেবিপূজা করিব লাউসেন বলিদানে।
এই কথা সঙ্করি বিধাতা সব জানে ॥
সুন মহাবির কালু আমি সব জানি।
[৫।খ] কার বোলে হারাইবে বিফল পরানি
এত সুনি বির কালু অতিসয় কয়।
উচিত বলিতে গালি দিবে মহাসয় ॥
আত্ম কথা কহিলে পাইবে পরিতাপ।
গোরুর রাখাল বেটা ছিল তোর বাপ ॥
কাননে রাখিত গোরু মুখে নাহি রা।
ঘরে ২ রাখালি সাধিত তোর মা ॥
কেহ দিত চালুখুদ পুরাতন কলাই।
অন্ন বিনে অকালে মরিল তোর ভাই ॥
তোর ছোট বনি সাঙ্গা পসিল ধিবরে।
আজি হৈলে ইছাই রাজা ঢেকুর ভিতরে ॥
জার পিতা কাননে উদক বিনে মৈল্য।
তার বেটা এখন ঢেকুরে রাজা হইল ॥
ইছাই রুসিল রনে রক্ষা নাঞি আর।
আচম্বিতে দুই বিরে বলিছে মার ২ ॥
পায়ে কাঁপে ধরনি ধরিতে ঢাল খাড়া।
মার মার সবদে সঘনে মেলা পাড়া ॥
হাথাহাথি দুই বিরে পড়িল হানকাট।
খগমনি ভুজঙ্গে জেন ঝুটিপাট ॥
উভা পাক দেই দুরে চাকের ভাঙরি।
সংগ্রাম[৪৩] বাজিল জেন সাদ্দুল কেশরি ॥

৪৩. পুথিতে 'সংগ্রামে' লিখে এ-কার কাটা হয়েছে।

আথালি পাথালি চোট ডুই বিরে হানে।
হান ২ হাকুনি বিস্বয় নাঞ্চি মানে ॥
ইছাই রুসিল রনে[৪৪] গোয়ালানন্দন।[৪৪]
ঢাল খাণ্ডা রাখিয়া ধরিল সরাসন ॥
অজগর গর্জ্জনে বলিছে হান হান।
ধনুকে জুড়িল ইছাই ইশ্বরির বান ॥
ভবানির বান হাথে বলে ডাক দিয়া।
এই সরে জমঘরে দিব পাঠাইয়া ॥
বলিতে ২ সর জুড়িল ধনুকে।
সন্ধান পুরিয়া মারে বির কালুর বুকে।
দেবতা পালায় ডরে বিষ্ণু মঘবান।
লক্ষন জুড়িল জেন রাবনেরে বান ॥
বান এড়িয়া দিয়া [৪৫] ইছাই[৪৫] বলে মার ২।
বাজিল কালুর বুকে পিঠে হইল্য ফার ॥
[ডাক] কালি ডুই বিরে জুদ্ধ প্রত্যুসবেহানে।
আজি দেখ আমার বিপত্য[৪৬] বিত্তমান[৪৬] ॥
এত স্তনি মহাবির সত্তরে গমন।
রাম জিন্যা ঘরে জেন চল্যাছে রাবন ॥
গড়ের ভিতরে গিয়া পুজে ভদ্রকালি।
জার পদসেবনে সম্পদ ঠাকুরালি ॥
বির কালু কোলে কর্য্যা লাউসেন কান্দে।
সাখা স্তকা তের দলই বুক নাহি বান্ধে ॥
[৪৭] অগ্যান [৪৭] হইল বড় ডোমের নন্দন।
শ্রীরামের বানে জেন বালি অচেতন ॥
ঢেকুরে লাউসেন রাজা মন কথা করে।
দ্বিজরূপরাম গান অনাদ্যের বরে ॥ * ॥ ৩॥

৪৪. পুথিতে এই অংশের আগে 'রক্ষা নাঞ্চি আর।' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে (লিপিদ্বিত্ব)।
৪৫. পুথিতে 'ইছাই' কথাটিতে বর্জনচিহ্ন দেখা যায়।
৪৬. বিত্তমানে (?), ক. বি. পুথিতে 'বিত্তমানে'। ৪৭. =অজ্ঞান।

দুখসুখ জত কিছু কপালের লেখা।
ঠিক দুফুর বেলা ধর্ম্ম জারে দিল দেখা ॥
তেরটি দলই কান্দে চক্ষে বহে ধারা।
বল বুদ্ধি বিদিসে সকল হইল্য হারা ॥
গড়াগড়ি কান্দে সভে নাঞি বান্ধে বুক।
সাখা সুখা কান্দিল বাপের চ্যায়া মুখ ॥
পিতা বিনে পুত্রের গলায়[৪৮] ছোঁগু[৪৮] কানি।
এত দিন সম্পদ বিপদ নাঞি জানি ॥
লাউসেন ধর্ম্মরাজা কৈল্য সুঙরন।
এইবার রক্ষা কর ঢেকুর ভুবন ॥
তিনবার ধর্ম্মরাজে সুঙরন কৈল্য।
অর্জ্জুনসারথি হরি দরসন দিল ॥
পিতামহ সহিত সমুখে দরসন।
সারি ২ চৌদিগে[৪৯] উনকুটি[৪৯] দেবগন ॥
ধবল বরনে দেখা দিল মায়াধর।
লাউসেনেরে কহিল মাগ্যা লেহ বর ॥
আমি নিরঞ্জন ধর্ম্ম অনাদি গোসাঞি।
অর্জ্জুনসারথি সখা মনে সঙ্কা নাঞি ॥
কালুবির মরিল ইছাই বিরের র[ভাখ] নে।
প্রান দিব এখনি জতেক দেবগনে ॥
উনকুটি দেবতা হইল্য তোর পক্ষ্যা বল।
কালুর বদনে গোসাঞি দিল পুষ্পজল ॥
প্রান পাইয়া বির কালু লম্ফ দিয়া উঠে।
সিংহার সর[৫০] নিতে[৫০] ইছাইর বল টুটে ॥
মর্য়াছিল বির কালু পাইল প্রানদান।
নআন ভরিয়া দেখ প্রভু ভগবান ॥

৪৮. ছোগু (<ছমগু)= মাতাপিতৃহীন অনাথ বালক, তু. ছোঁড় (জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল) তু. ছোঁড়া (আধুনিক বাংলা) ; ছোগু কানি=পিতৃবিয়োগজনিত অশৌচ বস্ত্র।

৪৯. =উনকোটি অর্থাৎ কিছুকম কোটি অর্থাৎ অসংখ্য।

৫০. শুদ্ধ পাঠ কি 'সুনিতে' ?

তেরটি দলই হইল আনন্দিত মনে।
দেবতার ঘটা হৈল্য ঢেকুর দক্ষিনে ॥
সভা করি দেবতা বসিল সারি সারি।
স্তব করেন সমুখে ময়নার অধিকারী ॥
জৌউঘরে আগুন দিলেক দুর্য্যোধন।
তথি রক্ষা পাইল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
পাতাল পদ্ধতি পথে পাইল্য পরিত্রান।
কে জানে তোমার মায়া কে জানে ধেয়ান ॥
আমি ধর্ম্ম[৫১] গোসাঞি অনাদি নিরঞ্জন[৫১]।
সঙ্কা না করিহ মনে রঞ্জার নন্দন ॥
রক্ষা আমি করিব ইছাই বিদ্যমানে।
অর্জুন রাখিল জেন সুধ[৫২] [ ][৫২] ॥
তোমার কারনে জত দেবতার ঘটা।
পুজা মত[৫৩] সদ্রস [৫৩] সমান হৈল্য ঘটা ॥
ঘোরতর ঘন ঘন ঘণ্টার বাজনা।
হান ২ সবদে ইছাই দিল হানা ॥
শ্রীরাম উদ্দেসে জেন আইল মেঘনাদ।
লাউসেন উপরে বড় পড়িল প্রমাদ ॥
মহা পরাক্রম দেখি দেবতা [৫৪] [ ][৫৪]।
আগু হইল লাউসেন ময়নার বির বরনে ॥
দেখাদেখি দুই বিরে সারিল সন্ধান।
অসি বিম্বু মুখে ঐরি স্তুণ্ডরে নিদান ॥
দুই বি [৭ক] রে ঢেকুরে দাণ্ডাইল্য একু ঠাঞি
তারক কার্ত্তিক জেন এক ভেদ নাঞি ॥
অসুর দেবতা দেখি অনুমান করে।
লাউসেন বলে তবে ইছাইয়ের তরে ॥

৫১. পুথির এই পাঠ অন্য কোন লেখার উপরে over-writing। নীচের লেখা দুষ্পাঠ্য।
৫২. এই অংশের লিপি অস্পষ্ট। 'অর্জুনে রাখিল জেন সুধর্ম্মার বানে (ক. বি. পুথি)
৫৩. =সদৃশ ৫৪. লিপি অস্পষ্ট

কলিজুগে মহাসয় তুমি কর্ম্ম দাতা ।
জে জার বয়েসে গুরু সেই তার পিতা ॥
তুমি আমার বয়েসে বিস্তর মহাগুরু ।
কি কহিব অল্প নহে[৫৫] গ্যান[৫৫] কল্পতরু ॥
রাজটিকা আপনি কপালে তোর দিব ।
কাগজ হিসাব[৫৬] কর্য়্যা[৫৬] ঢেকুরের কর নিব ॥
ইনাম দিব মাথায় পাগড়ি সয়বন্ধ ।
দুজনার মুখের বানি সুধা মকরন্দ ॥
এত সুনি ইছাই বির বলে বিপরিত ।
ময়নের ডরে পায়া করিবি পিরিত ॥
তোমার রুধিরে আমি নিব রাজটিকা ।
সাক্ষাত হইয়া কালি বলিল চণ্ডিকা ॥
ত্রিভুবনে তোর পারা না দেখি বর্ব্বর ।
কোন বেটা নিতে পারে ঢেকুরের কর ॥
গৌড়েশ্বর নব লক্ষে দলে ভঙ্গ দিল ।
দেবির খর্পরে দিতে মোর মনে ছিল ॥
মহাপাত্র সকলি পালাল্য হাথে হাথে ।
ইন্দ্র নাঞি কথা কয় আমার সাক্ষাতে ॥
আজ্ঞাকারিবস্ত বাতাস বার মাস ।
ব্রহ্মার গলায় বেটা দিতে পারি ফাঁস ॥
কহিতে বলিতে তবে ইছাই বির কোপে ।
অম্বরে ধনুক পেল্যা তিনবার লোফে ॥
দুই বিরে রুসিল সাক্ষাত হুতাসন ।
ধনুক ধরিয়া করে টঙ্কার সঘন ॥
রাম ২ সবদে সঘনে তির বিন্ধে ।
অঘোনিত লোচন হিরি জেন কাল নিন্দে ॥

৫৫. =জ্ঞান

৫৬. পুথিতে 'করি' লিখে পরে 'রি' কেটে 'র‍্যা' করা হয়েছে ।

সরাসন স [ ][৫৭] [৭খ] সমুখে সর জুড়ে।
অনর্থ হইল বড় অজয়ার গড়ে ॥
তিরে তিরে অবনি আকাস অন্ধকার।
দুজনার অঙ্গে উঠে রুধিরের ধার ॥
কবজ ভেদিয়া সর ঘন পড়ে গায়।
কিঙ্কিনির সবদ অনেক দুর জায় ॥
ইন্দ্রের উপরে পড়ে ইছাইর তির।
দেবতা সকল হইল গড়ের বাহির ॥
লাউসেনের পাটনে পর্ব্বত পরাজয়।
গোয়ালা গুনিল মনে জিবন সংসয় ॥
উল্কাপাত পারা রনে নিকলে পাটন।
ইসানে জলদ জেন বরিসে শ্রাবন ॥
সমান বরিসে সর দুই ধনুর্দ্ধর।
বিসম সন্ধান অঙ্গ হইল জর্জ্জর ॥
সর ধনুক রাখিয়া ধরিল খাণ্ডা ঢাল।
অমর অসুর কাঁপে অষ্ট দিগপাল ॥
দুই বিরে বিস্তর হইল গালাগালি।
রাউত সমান বটে দুই বির ঢালি ॥
মেলাপড়া জুড়িল সমরে সঙ্কা নাহি।
ঐইমনি উতারে অসি[৫৮] জে করে[৫৮] গোসাঞি ॥
বিক্রমে বিসাল জেন সার্দ্দুলকেসরি।
উড়াপাক ঘন দেই চাকের ভাঙরি ॥
তাড়াতাড়ি ঢালের উপরে চোট হানে।
অসিমুখে আগুন নিকলে চারিপানে ॥
ফলা [৫৯] রি মহাবির সারিল ফলঙ্গ।
কেসরি সমুখে জেন ঝঙ্কারে মাতঙ্গ ॥

৫৭. লিপি অস্পষ্ট।
৫৮. পাঠ সংশয়িত।
৫৯. লিপি অস্পষ্ট।

লম্ফ দিয়া লাউসেন ইছাইয়ে মারে চোট।
পড়িল ইছাইয়ের মুণ্ড ভুমে জায় লোট ॥
কাটা মাথা বাস্থলি রঙ্কিনি বলি ডাকে।
গড়াগড়ি জায় মুণ্ড দৈবের বিপাকে ॥
রন জিনি বসিল ম [৮ক] অনার তপোধন।
দ্বিজ রূপরাম গান সখা নিরঞ্জন ॥(*)॥৪॥

জয় দুর্গা বলিয়া মুণ্ড ডাকে উচ্চ স্বরে।
ইশ্বরি সুনিল বস্যা দেউল ভিতরে ॥
দেউল ভিতরে দেবি পুরে সরাসন।
গোয়ালার মুণ্ড হাথে ধরিল তখন ॥
কাটা মুণ্ড হাথে কর‍্যা কান্দেন ভবানি।
লোচনজুগলে ধারা সর্গ মন্দাকিনি ॥
কন্দের উপর মুণ্ড রাখিল জতন।
৬০ জিবন্নাস৬০ দিতে তথি বসিল জীবন ॥
পুনর্ব্বার প্রান জদি পাইল ইছাই।
বর মাগ ইছাই বলেন মহামাই ॥
জেই বর মাগিবে ইছাই সেই বর দিব।
মনের বাসনা তোমার সফল করিব ॥
বর মাগ ২ বলেন বাস্থলি।
স্তব করে ইছাই সমুখে৬৪ ক্রতাঞ্জলি৬১ ॥
জয়মুনি জগত জয়া জসোদানন্দিনি।
কংসের নিধন হেতু কৃষ্ণের ভগিনি ॥
দুখঃ বিনাসিনি দেবি মাগি এই বর।
কাটা মুণ্ড জোড় লাগে কন্ধের উপর ॥
ভবানি বলেন বাছা এই বর দিল।
এত বলি মহামায়া কান্দিতে লাগিল ॥

৬০. =জীবন্ন্যাস=মন্ত্রবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তু. মনসামঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।
৬১. =কৃতাঞ্জলি।

কান্দিতে কান্দিতে দেবি বলে ধিরে ২ ।
রাবনের বিপত্য পড়িয়া গেল তোরে ॥
কোন ছার বর নিলি অভয়চরনে ।
সতন্তর হৈতে সহশ্রলোচনে ॥
কান্দেন করুনাময় ভক্ত লৈয়া কোলে ।
তথাপি তোমারে রক্ষা এই রনস্থলে ॥
সদা ইন্দ্রজিত একা হইল ইছাই ।
দেবাসুর তরাসে পালায় ধায়াধাই ॥
শুড়ি [চাখ] শুড়ি জম ইন্দ্র তরাসে পালায় ।
মান করে গোয়ালা ফিরিয়া পাছ চায় ॥
শ্যামরূপা ব্রহ্মার জননি পক্ষ্যা বল ।
রনে দেখা দিল বির কাঁপে চলাচল ॥
বিরদাপে সঘনে সমুখে সিংহনাদ ।
বাসকি তক্ষ[৬২] কভু তেজে জিবনের সাদ ॥
লাউসেন বলে সুন ইছাই সুন্দর ।
ইশ্বরি পুজিয়া তুমি হইলে সতন্তর ॥
তথাপি আমার হাথে তোমার মরন ।
পরিনাম শুনিল জতেক দেবগন ॥
সর্ব্বকাল নাঞি থাকে রাজতি সম্পদ ।
বকাসুরা হাথে জেন ঠেকিল নাদ ॥
স্বরন লইলে বেটা রাখিব জিবন ।
পুনর্ব্বার দুই বিরে বাজে মহারন ॥
মার ২ সবদে দুই বিরে গালাগালি ।
দুজনে সমান বটে দুই বির ঢালি ॥
ইছাই বলেন তোর পুর্ব্বকাল জানি ।
ধর্ম্মপূজা কর‍্যাছিল তোমার জননি ॥
তোমা হৈতে আদ্যপুজা সাধিল প্রচুর ।
কায় বোলে আলি তুঞি মরিতে ঢেকুর ॥

---

৬২. =তর্ক্ষক (?) [সমাক্ষরলোপ]

লাউসেন বলে স্থন আমার বচন।
রাখাল বর্ব্বর তুমি কিবা জান রন॥
আমি জানি তোমার বাপের সন্তাপনা।
গরুর রাখাল ছিল পরিধান টেনা॥
বনের ফল খাইয়া বঞ্চিত সেই মাঠে।
সদাই মাগিত ভিক্ষা তারাদিঘির ঘাটে॥
মন্দমতি আপনি জাতের দোস আছে।
কিবা সঙ্কা এ কথা কহিতে তোর আছে॥
এত বলি দুই বিরে বাজে হা [৭ক] নাহানি।
রাম ২ ঘোরতর ভবানি ভবানি॥
কাকে বাজে উরুম্মাল বিসেস বিচক্ষন।
রন ২ সব্দ ঘন ঘণ্টার বাজন॥
লম্প দিয়া গগনে উঠিল দুই বির।
ঐইমনি উতারে অসি সন্ধানে সুধির॥
বিজুলির সমান সঘনে ঘোরে ঢাল।
অসি হানে ইছায়ে মঅনার মহিপাল॥
গড়াগড়ি জায় মুণ্ড বিসম সঙ্কটে।
ভূমে মুণ্ড পড়িতে ঐমনি কন্দে উঠে॥
রঙ্কিনি ভবানি মুখে বলে ঘনে ঘন।
কোন কালে ব্যর্থ নহে দেবির বচন॥
কাটা মুণ্ড জোড় লাগে ভবানির বর।
মার ২ সবদে ধনুকে জোড়ে সর॥
সর হারে সমরে সন্ধান সোল ধার।
বানে বানে দুই বিরে ঘোর অন্ধকার॥
বসুমতি ছাইল আকাস গাছপালা।
সরে ২ সন্ধান সমরে হইল [ ][৬৩] লা॥
কাটাকাটি বানে বানে বিষ্ণুপদতলে।
দেবতা কৌতুক দেখে বসিয়া বিরলে॥

৬৩. লিপি অস্পষ্ট।

পঞ্চাস হাজার সর বের্থ গেল রনে ।
ভবানির কল্পনা ইছাইয়ের পড়ে মনে ।।
ধনুকে ইছাই জোড়ে ইশ্বরির বান ।
আকাসপাতাল কাপে মহি মঘবান ।।
হাথে ধনুর্ব্বান বির লম্ফ দিয়া কয় ।
এবার লাউসেন তোর জিবন স' সয় ।।
বোলাচালে কল্পনা করিলে এতকাল ।
এইবার স্বঙর মনার[৬৪] মহিপাল ।।
এবার এ সর জদি রনে ব্যর্থ জায় ।
তবে জানি ধর্ম্মরাজা তোমাকে স্বহায় ।।
এত বলি বাঁ হাথে টঙ্কার ধনু চাপে ।
তথি সর জুড়িল সাক্ষা[৬৫] কাল সাপে ।।
সরের গর্জ্জন স্বনি সংসার কম্পিত ।
সিঞ্চিআ আকর্ন পানি বলে বিপরীত ।।
ধর্ম্মঠাকুর স্বঁঙরন করহ তুমি মনে ।
ে[ ][৬৬] বঙ্গ [৯ক]ন ধরিল জেবা রাখিল গোধনে ।।
অর্জুন রাখিল জেন স্বধন্বা সমরে ।
মনে কর সেই জন এবার জেন তারে ।।
এত স্বনি লাউসেন সঙ্কা বড় মনে ।
এক জুরে চাপে জোড়ে বত্তিস পাটনে ।।
বিপর্জ্জয় অকাল সবদ হুহুঙ্কার ।
জুগল সংঙ্কটে শুক্র বলে মার মার ।।
গগনে বসিয়া বলে জত দেবগন ।
কেবা হারে কেবা জিনে দেখিব এখন ।।
বান এড়্যা দিল ইছাই বিজুলির লতা ।
গর্জ্জনে গগন কাঁপে গিরিবর দাতা ।।

৬৪. সম্ভবত শুদ্ধ পাঠ 'ময়নার' ।

৬৫. =সাক্ষাৎ ।

৬৬. লিপি অস্পষ্ট ।

লাউসেনের মনে নাঞি মরনের ডর।
বত্তিস পাটনে রাজা কাটে সেই সর ॥
বান বের্থ গেল জদি লাউসেন কয়।
অপরঞ্চ ইছাই তোমার নাহি জয় ॥
এতদিন বিধাতা তোমারে হইল বাম।
অপরূপ সঙ্গিত রচিল রূপরাম ॥ (*) ॥৫॥
এইরূপে দুই বিরে করে কাটাকাটি।
মেলাপড়া জুড়িল সন্ধান পরিপাটি ॥
মরিলে না মরে বির গোয়ালানন্দন।
সুরাসুর বাখানিল লঙ্কার রাবন ॥
কেহো বলে ঢেকুরে কদাচ দেখি জয়।
বিধু বিষ্ণু বরুন বিরলে বসি কয় ॥
আনে বলে ইছাই বির হইল অমর।
সভা ভাঙ্গি দেবতা সকল জায় ঘর ॥
আনে বলে আর পুজা না পাইল গোসাঞি।
ঢেকুর নহিলে জয় পশ্চিম উদয় নাঞি ॥
বিষ্ণু বলেন এখানে ইশ্বরি অনক্ষন।[৬৭]
ত্রিভুবনে কেবা আছে ইছায়ে দেই রন ॥
এই গড় রাখিয়া ইশ্বরি জদি জান।
কলি জুগে ঠাকুর অপুর্ব্ব পুজা পান ॥
পড়িল আভার চিন্ত্যা দেবতাসভায়।
হনুমান বির বলে অনাদ্যের পায় ॥
জেই দেবলয়[৬৮] আছে বিষ্ণুর জননি।
সেইখা [১০।ক] নে বিধাতাকে পাঠায় আপনি ॥
লজ্জিত হইয়া দেবি ব্রহ্মা দরসনে।
অজয়া রাখিয়া জান কৈলাস দরসনে ॥
ভাস্কর দেখিয়া ভঙ্গ দিবেন ভবানি।
ইছাই নিধনে ধর্ম্ম পাব পুষ্পপানি ॥

৬৭. অনুক্ষণ। ৬৮. =দেবালয়ে (?)

অনন্ত বাসকি বলে এই জুক্তি সার।
আপনি চলিল বিধি দেউলদুয়ার ॥
চারিমুখে চারি বেদ মরালবাহন।
পরিধান পরিসর অরুন বসন ॥
দুর্গার দেউলঘরে দরসন দিল।
বিমান রাখিয়া বিধি দ্বারে বসিল ॥
ভাসুর দেখিয়া বধু লর্জ্জায় ব্যাকুল।
স্যামরূপা দেশান্তরি ভাঙ্গিয়া দেউল ॥
দেহারা রাখিয়া দেবি দুরে দরসন।
স্তব করে চরনকমলে দেবগন ॥
সহস্রলোচন আদি জত সুরাসুর[৬৯]।
কৈলাস পয়ান করে রাখিয়া ঢেকুর।
অজআ হইলে জয় পুর্ন্ন বারমতি।
সত্যের আমুনি তুমি গঙ্গার সহিতি ॥
এত সুনি ভবানি বলেন ক্রোধমুখি।
ঢেকুরে সহস্র ফনা গলায়ে বাসুকি ॥
দেবি বলে দেবতাসকল ঘরে জাও।
পুজা বিনে বিদেসে বিফল দুখ পাও ॥
সুন বাপু বরুন তোমারে কই দড়।
কাত্তিক গনেস হইতে ইছাই বির বড় ॥
বড় পুত্র ইছাই বির অন্ব[৭০] গনাই।
ঢেকুরে[৭১] বরুন কেন বিধাতা গোসাঞি ॥
[৭২] মনে কর নিভাঅন হইয়া গৌরব।
একে ২ দেবতা কাটি বল হে সব ॥[৭২]
এত সুনি দেউলে বসিলা হৈমবতি।
দেবতা অসুর করে ইছায়ের জুগতি ॥

---

৬৯. পুথিতে 'দেবগণ' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। ৭০. অন্ত (?)।
৭১. এর আগে পুথিতে 'দেবতা কেন' লিখে কাটা আছে।
৭২. অর্থ সংশয়িত।

বিরলে বসিয়া জুক্তি করেন দেবতা।
সপ্তম পাতালে রাখ ইছায়ের মাথা॥
এত স্তনি সর্ব্বজয়া হইয়া হরসিত।
দ্বিজ [১০।খ] রূপরাম গান ধর্ম্মের সঙ্গিত॥*॥৬॥
কাটা মুণ্ড কন্ধের উপরে জোড় লাগে।
দেবতা সভায়েতে বিস্বয় বড় লাগে॥
তুমি জদি মনে কর বির হনুমান।
তবে সে আনন্দে অনাদি পুজা পান॥
এই কার্য্য নহে অর্ন্য দেবতা সকতি।
ধ্যান জোগে বাতা[৭৩] পাইল জুগপতি॥
ইন্দ্র বলে স্তন অহে মরূতনন্দন।
ইছায়ের মুণ্ড রাখ পাতাল ভুবন॥
তোমার হেতু রাবন রাজার হইল সর্ব্বনাস।
রামাঅনে লিখিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥
দেবতা স্বরন কালে হৈলে সদয়।
রনে দেখা দিল বির পবনতনয়॥
লাউসেনে ইছাই বিরে হইল মহারন।
ইন্দ্রজিত সঙ্গে জেন স্তমিত্রানন্দন॥
কিবা রামরাবন ইছাই জুগে অবতার।
সেইরূপে ঢেকুরে পড়িল মহামার॥
চাকের ভাওরি জেন ফেরে দুই বির।
হরিহর বিধাতা সমুখে নহে স্থির॥
ঢালের উপরে অসি পড়ে ঝনঝান।
কাল ঘোম ভাঙ্গিল স্বগরে ভগবান॥
বিক্রমে বিসাল দুই ঢালে মিসামিসি।
আগু হইয়া ইছায়েরে উপরে হানে অসি॥
অবনি উপরে পড়ে ইছায়ের মুণ্ড।
জয়দুর্গাবাসুলি রঙ্কিনি বলে তুণ্ড॥

---

৭৩. বার্ত্তা (?)

তবে হনুমান মুণ্ড ধরে দুই হাথে।
বচন বলিতে পাইল্য পাতালের পথে ॥
ঐমুনি পড়িল গিয়া বাসুকির মুখে।
প্রিজুস[৭৪] বলিয়া খায় মনের কৌতুকে ॥
সর্ব্বলোক বলেন ঢেকুরের হইল্য জয়।
ইছাই পড়িল সব্দ হল্য অতিসয় ॥
দেউল দুয়ারে দেবি দেখিল তখন।
রনস্থলে আপনি দিলেন দরসন ॥
কাটা [১১ক][৭৫] মুণ্ড গড়াগড়ি কন্ধ নাহি কাছে।
এত দুর্খঃ এহার লর্ল্লাটে লেখা আছে ॥
কোপে কম্পমান হৈল্য দেবি ত পার্ব্বতি।
দেখিল পর্ব্বত কাতি পাতাল দুর্গতি ॥
জোগধ্যানে জানিল পাতালে মুণ্ড পাব।
ইছায়ের সমুখে লাউসেনর রক্ত পিব ॥
প্রান দিব পুনর্ব্বার গোয়ালানন্দন।
কান্দিতে ২ জান পাতাল ভুবন ॥
বাসুকি সমুখে দেবি দিল দয়সন।
আপনি বলেন তারে করুন বচন ॥
মোর পুত্র ইছাই বিয় বিদিত সংসারে।
তবে কেন তার মুণ্ড কর‍্যাছ সংহারে ॥
সংহার করিলে মুণ্ড উগারিয়া দেহ।
চন্দন চাঁপার মালা আসির্ব্বাদ লেহ ॥
নতুবা এহার সাস্তি পাইবে এখন।
না বলিতে মুণ্ড দিল দেবি বিত্তমান ॥[৭৬]
আপনি ইছাইর মুণ্ড নিল বামকরে।
পুনর্ব্বার দেখা দিল দক্ষিন ঢেকুরে ॥

৭৪. =পীযুষ (?)।

৭৫. ১১ পৃষ্ঠার মাথায় বাঁ দিকে 'শ্রীশ্রীরাম সন ১০৩৯ সাল' লেখা আছে

৭৬. 'বিত্তমানে' লিখে এ-কার কাটা আছে।

কন্দের উপরে মুণ্ড রাখিল ভবানি।
পুনর্ব্বার প্রান দান দিলেন আপনি ॥
প্রান পাইয়া ইছাই চৌদিগ পানে চায়
ধর্ম্মের মঙ্গল দিজ রূপরাম গায় ॥*॥৭॥
একমনে স্থন সভে ধর্ম্মের কথন।
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধন্যার ধন ॥
প্রান পাইল ইছাই দেখিল সর্ব্বজন।
প্রতিঙ্গা করিল দেবি তার বিদ্যমান ॥
স্থন রে গোয়ালাবির বলি[৭৭] বিদ্যমান।[৭৭]
লাউসেনে কাটিয়া করিব রক্তপান ॥
তবে জদি রক্তপান না করি ইছাই।
মহেস কার্ত্তিক গনেসে মাথা খাই ॥
সমরে বলিল দেবি প্রতিঙ্গা বিসাল।
পুরন্দর বিধাতা কাঁপেন জমকাল ॥
বর্জ্জে্র সমান হইল প্রতিঙ্গাবচন।
হান ২ সর্ব্দ ঘন ঘণ্টার নিসান ॥
ইশরি সমুখে ইছাই করে জোড়হাথ।
অমঙ্গ [১১।খ]ল অনেক আপনি উল্কাপাত ॥
বিষম প্রিতিঙ্গাবানি বের্থ কভু নয়।
দেবির বিক্রম দেখি দেবতার ভয় ॥
পুনর্ব্বার ঢেকুরে দেবতাসভা হইল্য।
আনে বলে এবার লাউসেন রাজা মৈল্য ॥
আপনি হানিব এবার ময়নার বির।
প্রিতিঙ্গা করিল পান করিব রুধির ॥
পার্ব্বতির বাক্য জেন পাসানের রেখ।
জুগে ২ দেবতা দেখিল পরতেক ॥
প্রভুর সমুখে কিছু বলে হনুমান।
এবার লাউসেনে রক্ষা কর ভগবান ॥

৭৭. এখানে লিপিভ্রম হয় নি তো ?

পড়িল আভার চিন্তা কি হবে উপায়।
সভা ভাঙ্গি দেবতাসকল ঘরে জায় ॥
দেবতা সভাই জায় মুখে নাঞি বানি।
হেন কালে বলেন উল্লু্ক মহামুনি ॥
বিশ্বকর্ম্মা মনে কর সুন মহাসয়।
মায়ামুণ্ড রচিলে লাউসেন রক্ষা হয় ॥
ইশ্বরির সমুখেতে রচিব কল্পনা।
আপনি পালাইয়া জাব দৈবের ঘটনা ॥
এত সুনি দেবতা সভাই সায় দিল।
বিশ্বকর্ম্মা করি মনে স্বঙরন করিল ॥
ধাইল বিসাই বেগে ধর্ম্মের নিঅড়।
উল্লু্ক বাহনে পাইল ঢেকুরের গড় ॥
স্বর্গ হইতে বিসাই আইল্য ততক্ষন।
দেবতা সমুখে দিলেক দরসন ॥
বিধাতার সাধ্য জত দেবতার মাঝ।
অন্ন্য বলে বিলম্ব না সহে ধর্ম্মরাজ ॥
মায়ামুণ্ড রচিলে লাউসেন রক্ষা পায়।
ভঙ্গ দিয়া নতুবা দেবতা ঘরে জায় ॥
এত বুলি বিসাই পাতিল কারখানা।
রঙ্গসাটে জোকাটে হিঙ্গুল রূপা সোনা ॥
বারগাছি নারিকেল তের গাছি তাল।
সেইখানে বিসাই পাতিল ধর্ম্মসাল ॥
বাম হাত জাঁতা টানে হুতাসন হরি।
[১২।ক] মায়ামুণ্ড হেতু মনে করিল ইশ্বরি ॥
বিসেসে কল্প কর্ন কিবা হরিতাল।
কাঞ্চন কুণ্ডল কানে চৌরস কপাল ॥
গজেন্দ্র জিনিঞা নাসা অতি মনোহর।
রাজদণ্ড সোভা করে কপাল উপর ॥

নির্ম্মান হইল মুণ্ড হইল্য উর্জ্জল।
রুধির ভরিল তায়ে দিল লায়ের জল॥
সুনিত বলিয়া দেবি করিব ভক্ষন।
তবে পরিপুর্ন্ন তার প্রিতিজ্ঞাবচন॥
দেবতার সমাঝে বসিলা লাউসেন।
মুণ্ডের উপরে মুণ্ড সুসারিয়া দেন॥
হাথ পাঅ [ ][৭৮] গন্ধময় নিল।
বাম গালে তুল্যা দিল পঞ্চ গোটা তিল॥
অম্বিকারে আচম্বিতে কল্পনা রচিত।
ইন্দ্র আদি দেবতা হইল কম্পিত॥
কানে ২ বিধি বিষ্ণু বলেন আপনি।
মন দিয়া সুন রে ময়নার গুনমনি॥
দ্বিতিয় প্রহরে আজি বধিব ইছাই।
ভবানির সমুখে বাপু সাবধান চাই॥
জত আছে দেবতা তোমার পাছুআন।
দনুজদলনি কাছে হবে সাবধান॥
নারদে বলিল লাউসেনের কাছে থাক।
তুমি মন করিলে লাউসেন বিরে রাখ॥
পুর্ন্ন হইলে প্রতিজ্ঞা বলিবে কুবচন।
পালাইবে কৈলাসসিখর জথা ত্রিলোচন॥
এসব জুগতি দেবতা জদি বলে।
লুকাইল নারদমুনি গাছের আড়ালে॥
প্রান হাথে করিয়া দেবতাসব রয়।
রনে দেখা দিল বির রঞ্জার তনয়॥
একুবারে লাউসেন সহস্র সর জুড়ে।
ইছাই বির সমুখে দেবির গাএ পড়ে॥
ঝাকে ২ সর পড়ে ভবানির গায়।
লাউসেন বিরে দেবি দেখিবারে পায়॥

৭৮. লিপি দুর্বোধ্য।

হান ২ সর্ব্বে তবে হয় নিদারুন।
ঝলকে ঝলকে চক্ষে [১২।খ] নিকলে আগুন ॥
বাম হাথে খাপর দক্ষিন হাথে অসি।
কাল ঘাম নিশ্বরে বদন হইল্য সসি ॥
অভয়া লাউসেনে অসি হানেন আপনি।
কাটা কন্দ মায়ামুণ্ড পড়িল অবনি ॥
অগ্গান[৭৯] হইল বির গড়াগড়ি জায়।
অবিলম্বে ইশ্বরি খাপর পাতে তায় ॥
খাপর রুধির পুর্ন্ন ধরিল ভবানি।
গাছের আড়ে দেখিল নারদ মহামুনি ॥
হাথে ধরি খাপর ইছায়ের পানে চান।
এই দেখ লাউসেনের রক্ত করি পান ॥
এত কাল নাম ছিল হরিভক্তিদাতা।
এখন রাক্ষসি নাম রাখিল বিধাতা ॥
এত বলি রক্ত পান মনের কৌতুকে।
হাসিয়া বলিল দেবি ইছাই সমুখে ॥
এতদিন লাউসেন বাড়িল রাজভোগে।
তবে কেন এই রক্ত স্বাদ নাহি লাগে ॥
জিগ্গাসিল এত জদি ব্রাহ্মার[৮০] জননি।
হেন কালে দেখা দিল নারদ মহামুনি ॥
আমিবস্তা সমুখে নারদ দেখা দিল।
ভুমিষ্ঠ হইয়া পদে প্রনাম করিল ॥
আসিস করিল দেবি হরিভক্তি হউক।
সর্ব্বকাল বিষ্ণুর চরনে মতি রক ॥
আসিস করিল জদি হেমন্তের ঝি।
নারদ বলেন তবে নিবেদন কি ॥

৭৯. =অজ্ঞান।
৮০. =ব্রহ্মার।

হরিভক্তি সদাই বলেন সর্ব্বজন।
আকস্মাত তবে কেন রুরির[৮১] ভক্ষন ॥
মনস্তের রুধিরে কেমনে ভক্তি হইল।
এহা দেখ্যা দেবতা সকল হাস্যা মৈল্য ॥
এ তিন ভুবনে পুর্ন্ন হইল এই লাজে।
কেমনে বসিবে মা দেবতা সমাঝে ॥
ডাখিনি হইলে তুমি কে বলে ইশ্বরি।
নিশ্চয় সংসারে বলে অসুরভাতারি ॥
লাউসেনের রক্তে জদি স্বাদ নাহি [১৩ক] পায়।
সমুকে আছে ইছাই ঘোষ ঘাড় ভাঙ্গ্যা খায় ॥
এত বলি নারদ উঠিয়া রড দিল।[৮২]
ব্রহ্মার জননি বড় জলন্ত হইল ॥
মাস খাব নারদের হাড়ে কামড় দিব।
কেমন দেবতা আজি নারদে রাখিব ॥
প্রান লয়্যা পালায় নারদ মুনিবর।
তার পাছু ভবানি বলিছে ধরধর ॥
মহামুনি হানিতে ইশ্বরির ইর্চ্ছা আছে।
কেহো বলে নারদ মুনি কাদাচিত বাঁচে ॥
তরাসে পালায় মুনি কৈলাসের পথে।
তার পাছু হৈমবতি খাণ্ডা ঢাল হাথে ॥
প্রান ভয়ে ধায় মুনি লইয়া আপনা।
আলাল্য মাথার কেস পথে পড়ে বিনা ॥
নবগুন পইতা পড়িল দুই পায়।
পালাইতে পরিধান আপনি আলালায় ॥
জয় ইন্দ্র পবন পালাঅ কাপিল তার ডরে।
দারুন বিপত্য হইল নারদ উপরে ॥

৮১. =রুধির (?)

৮২. পুথিতে 'দিল রড' লিখে কাটা আছে।

পড়িল ঐমুনি উঠে উভমুখে ধায় ।
হাথাহাথি নারদ কৈলাস গিয়া পায় ॥
ত্রিসায় আকুল তনু নারদ বিকলে ।
ঐমুনি লুকাইল গিয়া মহেসের কোলে ॥
মাথায় বসন দিল নিজ রূপ ধরি ।
নারদ বলেন মামা নিবেদন করি ॥
মামা কিছু নাঞি জান মামির চরিত ।
মনস্য কাটিয়া মামি খাইল স্থনিত ॥
মনুস্যের রক্তে কেমনে ভক্তি হইল ।
সভা বিদ্যমানে মামি ভক্ষন করিল ॥
মনস্য কাটিয়া মামি খাইল্য এখন ।
ঐ দেখ বদনকমলে নিদরসন ॥
মামা কিছু জান নাঞি মামির হাথ নাড়া ।
জার তার সঙ্গে মামি ধরে ঢাল খাড়া ॥
দেবতা তোমার ঘরে নাঞি খাব জল ।
দ্বিজরূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥ * ॥ ৮ ॥

দেবতাসকল দেখি লাউসেনে কয় ।
[১৩।খ] ইছাই নিধন কয় স্থন মহাসয় ॥
সচেতন হইল ময়নার তপোধন ।
লাফ দিয়া উঠিয়া ইছায়ে মাগে রন ॥
গোয়ালা উপরে জেন পড়ে বজ্র্যাঘাত ।
আকস্মাৎ বিস্তর হইল উল্কাপাত ॥
ইন্দ্র বলে ইঙ্গিতে মেঘের আড়ে বসি ।
মনে পরিজ্ঞান বাসে ধর্ম্মর তপসি ॥
গড়ে নাঞি ভবানি বিলম্ব নাহি সয় ।
ঢেকুর জিনিলে পুর্ন্ন বারমতি হয় ॥
রনস্থলে গোয়ালার বাম আখি নাচে ।
দয়ামঅ লাউসেন বলে তার কাছে ॥

দেবতাচরনে বেটা ভ্রমন করিলি।
মঙ্গলবাসরে কালি পুজা না করিলি॥
এত স্নুনি মহাবির অগ্নির সমান।
খাণ্ডা ফলা ধরিআ বলিছে হান হান॥
রাবনের পারা কেন রনে ভঙ্গ দিব।
তবে জদি পরাজয় এথানে মরিব॥
জয়দ্রত পরাজয় কর্য্যাছিল রনে।
তার অপজসকথা ঘুসে সর্ব্বজনে॥
এক রন স্থন তায় তোমার সমুথ॥
তাহাকে অধিক আর কোথা পাবে স্থখ॥
তরনি তনয় কর্ন্ন সমরে নিধন।
বলি পারা ভাব কেন অস্থরনন্দন॥
এত বলি বিরেরে রূসিল কাল জম।
ভিম অর্জ্জুনে সনে জেন বাজ্যা গেল রন॥
বোলাবোলি দুই বিরে লাগিল গালাগালি।
একুই সমান রনে দুই বির ঢালি॥
ফলা অসি ঝঙ্কারে ফলঙ্গ চারি পাচ।
সর্ব্ব স্রিষ্টী কাঁপে জলে কাঁপে মাচ॥
ঢালে ঢালে ঝাকনি উর্ম্মাল তথি বাজে।
ঘোর সর্ব্ব অকারণ হুঙ্কার রনমাঝে॥
পাটনে ছাইল মহি অমর অবনি।
দুজনার মনে নাঞি দিবস রজনি॥
সল্য বাজি বৈসে একে তায় সন্ধ্যাকাল।
অমাবস্যা ঘোর তিথি তিমির অকাল॥
ঢেকুরে বিরূপ বা [১৪।ক] স্থ সর্ব্ব লয়ে ঘোর।
স্তর্দ্ধমান রনে হইল ইছাই কোঁঙর॥
ফলাঙ্গ চঞ্চল গুরু ইছাই আসি হানে।
ভাগ্যে পুন্নে ইছাই বাঁচিব সেইখানে॥

ঘন ঘন উড়া পাক ঘামে টলবোল।
ঢালে বাজে উরুমাল ঘণ্টার ঘনরোল॥
উলটি পালটি হানা পড়ে ঝনঝন।
মার মার সবদে বরসে খান খান॥
পাবক নিকালি চক্ষে বদনে রুধির।
জয় রাম গোপাল গোবিন্দ বলে বি঳॥
ঘোর সব্দে ঢেকুরে ঝনঝনা জেন পড়ে।
কেহো বলে সাৰ্দ্দুল সিংহ জেন লড়ে॥
ইছায়ের মুণ্ড হানে মঅনার রায়।
ধুলায়ে ধুসর মুণ্ড গড়াগড়ি জায়॥
পুনরপি কন্দে বসি বলে কাট কাট।
ফেপা টুটি ফলঙ্গ সঘনে ফলা পাট॥
বিপাক অনর্থ হইল অজয় ভিতর।
পরাজই মানিল দেবতা পুরন্দর॥
বিরলে বসিয়া জুক্তি করেন দেবতা।
বৈকুণ্ঠ ভুবনে রাখ ইছায়ের মাথা॥
পরকালে ইছায়ের হব দিব্য গতি।
পরিনাম পবিত্র করিল ভগবতি॥
চতুর্ভুজ হইব সাক্ষাত ত্রিলোচন।
এই জুক্তি অসুরদেবতা মুনিগন॥
হনুমানে বলিল জতেক দেবগনে।
ইছায়ের মুণ্ড রাখ ব্রহ্মার চরনে॥
এত সুনি হনুমান পবননন্দন।
বলিল সমুখে সুন মনে নিবারিয়া মন॥
দুই বিরে সমর দুরন্ত অভিময়।
ভঙ্গ দিতে ইছাই বির আগুপাছু হয়॥
সিকিনি গিধিনি পড়ে গায়ের উপর।
দেখিয়া কাঁপিল তার তনু কলেবর॥

নিরঞ্জনের মায়া কহনে নাঞি জায়।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥ * ॥ ৯ ॥
ইশ্বরি ইছাই তরে হইল বিমুখ।
আচম্বিতে হাথে হইতে পড়িল ধনুক ॥
ঢাল খড়্গ তুলিবা [১৪।খ]রে নাহিক সকতি।
লাউসেন ইছায়ে হানিল সিভ্রগতি ॥
গড়াগড়ি জায় মুণ্ড হনুমান ধরে।
বৈইকুণ্ঠের পথ বির পায়ে উরূ করে ॥
বাম দিগে কৈলাস সমুখে সুরধনি।
ধাইআছে বৈইকুণ্ঠ মুখে প্রসন্ন সরনি ॥
দুহাতে ধরিআ মুণ্ড বিস্তর জতনে।
গোলকে রাখিল লইয়া ব্রহ্মার চরনে ॥
মুক্ত হইল ইছাই হইল জয় ২।
সমরে গোলা[৮৩] বির পড়িল নিশ্চয় ॥
রন জিনি বসিল মঅনার ইশ্বর।
জোড়া সিংহা পুরে কালু বলে ধরধর ॥
ঢেকুর হইল জয় বলে সর্ব্বজন।
রন জিনি লাউসেন ভাবে নিরঞ্জন ॥
ধর্ম্মের মায়া কহনে নাঞি জায়।
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায় ॥ * ॥ ১০ ॥
হরগৌরি কৈলাসে[৮৪] আছেন দুইজনে।
আচম্বিতে ইছাই পড়িয়া গেল মনে ॥
পুনর্ব্বার ভবানি আইসেন ঢেঁকুর গড় পায়।
রনস্থলে কাটা কন্ধ গড়াগড়ি জায় ॥
কান্দেন করুনাময়ই ভক্ত করি কোলে।
পুত্র মৈল্য জননি ফুকরিয়া জেন বুলে ॥
ও ইছাই রে বারেক বাহড়।

৮৩. সম্ভবতঃ শুদ্ধ পাঠ 'গোয়ালা'।
৮৪. পুথিতে এর আগে 'দুইজনে' লিখে কেটে দেওয়া আছে।

ইছাইর মুণ্ড যদি এইবার পাই।
ব্রহ্মার উপরে রাজা করিব ইছাই॥
কাটা কন্ধ স্যামরূপা কোলেতে করিয়া।
দেউল দেহারা পুরে উত্তরিলা গিয়া॥
বার বৎসরের কালে ইছাই হারাইয়া।
দারুন তসালা[৮৫] দেবি দিলেন খুঁজিয়া॥
একে ২ খুজিল ঢেকুরের সাত গড়।
লোটাইয়া কুন্তলভার অঙ্গের কাপড়॥ [৮৬]
নহে জুগল হইল আসাড় শ্রাবন।
খুজিল অজয়া নদি দুকুল কানন॥
কাসি কান্তি খুড়িল[৮৭] গোকুল হরিদ্বার।
লঙ্কা খুজিল মুণ্ড সমুদ্রের পার॥
[১৫।ক][৮৮] সপ্তম সাগর নেহালে অবতার হইয়া।
চালিলা সিন্দুর বালি চালনি করিয়া॥
তথাপি না পাইল মুণ্ড গনেসের জননি।
বিরাট খুজিলা দেবি পশ্চিম অবনি॥
কোথা গেলে ইছাই বির চক্ষে নাহি দেখি।
কি কহিব কোথা জাব বল মোরে সখি॥
আর কোথা গেলে ইছাইর মুণ্ড পাব।
কি করিব পদ্মাবতি আর কোথা জাব॥
দুগ্ধ দিতে দয়া নাঞি কাত্তিক গজাননে।
বরপুত্র ইছাই বির সদাই পড়ে মনে॥
ইছায়ের সোকে দেবি সহজে আকুল।
বর্জ্জের সমান হইল নয়ানে রাতুল॥
আপনা খাইয়া নারদে তাড়া দিল্য।
ইছা হেন বরপুত্রে রনে হারাইল্য॥

৮৫. তসালা =বড় খিল। তু. তসলা (মাণিকরাম) <আরবী tasalsul
৮৬. পুথিতে প্রথমে 'অম্বর' লিখে পরে কেটে দিয়ে 'কাপড়' লেখা হয়েছে।
৮৭. শুদ্ধ পাঠ 'খুজিল' (?)
৮৮. পৃষ্ঠার মাথায় বাঁ দিকের মার্জিনে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ' লেখা আছে।

আসি মসি দিত বিসাসয় ছাগল।
অবনি হইত জেন সাক্ষাত কমল ॥
বলিতে না পারে কেহ সরস বচন।
চরন কমলে পদ্মা করে নিবেদন ॥
কি কর্ম্ম তোমার মনে ইছায়ের সোক।
তোমার সেবনে সেই পাইল পরলোক ॥
সখির বচন স্থনি পাইল ঢেঁকুর।
বিমলিত বসন কুণ্ডল কর্ন্নপুর ॥
অভয়া বলেন পদ্মা স্থন মোর বানি।
ইছায়ের অগ্নিকুণ্ড করিব আপনি ॥
এত বলি দেখা দিল ঢেঁকুর দেউলে।
কাটা কন্ধ ভবানি আপনি নিল কোলে ॥
অজয়া নদির জল পাইল সর্ব্বজয়া।
ভাগ্যবতি অজয়া পাইল পদছায়া ॥
নির্ম্মান করিল কুণ্ড আগোর চন্দনে।
চাঁপা নাগেশ্বর কিবা মল্লিকার সনে ॥
চন্দনের গাড্যা দিল চন্দনের কাট।
নির্ম্মান করিল কুণ্ড অজয়ার ঘাট ॥
বেদ পড্যা ইছাই বিরের করাইল স্না [১৫।খ]ন
গঙ্গাজল তুলসি মল্লিকা সাবধান ॥
তার উপর ইছাই বিরে করাইল্য সয়ন।
তিন বার উচ্চারিল বেদের বচন ॥
মহাবাক্য উচ্চারিল হেমন্তের স্থতা।
জহ্নুকুলজননি আপনি অগ্নিদাতা ॥
নাড়িয়া ঝাড়িয়া মা পোড়াল্য ইছাই।
সাগরে পেলিতে অস্তি রাখিল তথাই ॥
তের পিণ্ড দান দিল আপার তর্পন।
মনে হয় গয়ায় সাধিব সপিণ্ডন ॥

স্নান সন্ধ্যা পুনরপি অজয়ার জলে।
কান্দিতে ২ গেলেন অজয়ার দেউলে ॥
ইছাই বিয়ের ঘর দেখিয়া নারাঅনি।
কাছাড় খাইয়া ভুমে পড়িল ভবানি ॥
কপাট পুঞট নাথ ইছায়ের ঘর।
ছায়নি মউর পাখা হাঁড়িয়া চামর ॥
কান্দিতে কান্দিতে দেবি চারিপানে চান।
লাউসেনে সর্ব্বজয়া দেখিবারে পান ॥
নআনে দেখিল জদি মঅনার রাজা।
লাউসেনে হানিতে দেবি হইল দসভুজা ॥
মোর বানি ব্যর্থ হইল্য না জানি নিশ্চয়।
এইবার এহার রক্ত খাইব নিশ্চয় ॥
এত বলি লাউসেনে দেবি জান।
সমুখে লাউসেন বলে অঝর নয়ান ॥
পুর্ব্বকালে এই অস্ত্র দিয়াছিলে তুমি।
ময়নার দক্ষিন ঘরে গিয়াছিলে আপনি ॥
বেবস্থার বেস ধরি আখড়ার সালে।
এই খড়্গ আপনি দিয়াছ পুর্ব্বকালে ॥
তবে জদি আপনি করিবে রক্তপান।
এই খড়্গে উচিত আমারে বলিদান ॥
এত বলি খড়্গ দিল ইশ্বরি সাক্ষাতে।
লাউসেন কাটিতে দেবি অস্ত্র নিল হাথে ॥
নিজ অস্ত্র দেবি পাইল নিদরসন।
পুর্ব্বের কা [১৬।ক] হিনি তবে পড়িল তখন।
পরিচয় পাইল তুমি কানড়ার স্বামি।
সিমুল্যার গড়ে তোমার বিভা দিল আমি ॥
এই খড়্গ দিল তোরে আখড়া মন্দিরে।
তুমি ধর্ম্ম অবতার জেন জুধিষ্ঠিরে ॥ ৮৯

৮৯. পুথিতে 'জুষ্টিরে' লিখে উপরের মার্জিনের সমান্তরাল জায়গায় 'ধি' লেখা হয়েছে।

কানড়ার স্বামি তুমি আমার জামাতা।
এতক্ষন ঢেঁকুরে না বলিলে কথা॥
জামাতা ভরমে দেবি দিল মাথায় বসন।
বলেন করুনাময়ই বাক্যে দিবে মন॥
সর্ব্বকাল কানড়া আমার প্রিয় ঝি।
এতদিন হইল তার কর্ন্যাপুত্র কি॥
পালন করিবে কানড়া বিদ্যাধরি।
তোমার সাসুড়ি আমি ত্রিদস ইশ্বরি॥
বিনা দোসে বিস্তর বলিল কুবচন।
খাইয়া লাজের মাথা ইছাই কারন॥
সর্ব্বকাল কল্যানে কুসলে থাক রায়।
বর দিল সর্ব্বজয়া সেনেরে বিদায়॥
পুনরপি দেখা দিল ঢেঁকুর ভুবন।
ইছাই কারনে মাতা করিছেন রোদন॥
গোয়ালার ঘর দেখি কান্দেন ভবানি।
ইছাই মরিব রনে আমি নাহি জানি॥
চারি চাল ছায়নি চামর গঙ্গাজল।
দেখিয়া সকল দেবি পরান বিকল॥
এইখানে ইছাই করিল দানধ্যাআন।
এইখানে ত্রিসন্ধ্যা সুনিত পুরান॥
এইখানের দানেতে কৃষ্ণের পিরিতি।
এইখানে রজনি বঞ্চিত নাটগিতে॥
এখানে ইছাই বসিত অভিরত।
এইখানে এই দিন সুন্যাছি ভাগবত॥
ব্রহ্মার জননি বড় কান্দিল বিস্তর।
সব কথা আমার মনে জাগে নিরন্তর॥
এখানে সদাই নাচিত রামজানি।
এইখানে ইছাই বির বসিত আ [১৬।খ] পনি॥

এত বলি হেম ঘটে [৯০] দিল বিসর্জ্জন।
আজি হইতে অজয়া হইল ছয় মাসের গন ॥
মনে নাঞি মহেস কার্ত্তিক লম্বোদর।
কান্দিয়া ব্যাকুল দেবি ধুলায় ধুসর ॥
পদ্মার সঙ্গতি ছিল গঙ্গার জিবন।
দেবির বদনে দিয়া বলেন বচন ॥
চল দুর্গা কৈলাস বিলম্বে কার্য্য কি।
তুমি জয়া জননি জনক রাজার ঝি ॥
জসোদানন্দিনি তুমি রাধা ঠাকুরানি।
তুমি সত্যবতি সতি সাবিত্রি ইন্দ্রানি ॥
বিসম তোমার খেলা আদ্য অন্ত নাঞি।
এমন তোমা সেব[৯১] কত আছে কত ঠাঞি ॥
তোমার সেব[৯২] তার হইল সর্গবাসি।
তুমি গঙ্গাসাগর গোবিন্দ গর্গবাসি ॥
এত কালে ভজিলে সম্পদসুখ পায়।
অন্তকালে পুরট বিমানে সর্গ জায় ॥
দস হাজার বৎসর ঢেঁকুরে বাস করে।
পুনরপি তেঁহ রাজা ঢেঁকুর ভিতরে ॥
কর্ম্ম বির জেষ্ট মৈল্য বিরচুড়ামনি।
আপনার মন তুমি না জান আপনি ॥
গোবিন্দভগিনি তুমি হইলে গোকুলে।
পুরসোভা হইলে তুমি জমুনার জলে ॥
বিপর্য্যঅ খেলা তোমার অন্ত নাঞি পাই।
অজয় ঢেঁকুর রাখি কৈলাসে চল জাই ॥
কি বলিব দেবতা সঙ্কর মহাসয়।
ইছায়ের সোক তোমারে সমুচিত নয় ॥

৯০. পুথিতে প্রথমে 'ঘাটে' লিখে 'আ'-কার মুছে দেওয়ার সংকেত আছে।

৯১ সম্ভবতঃ শুদ্ধ পাঠ 'এমন তোমার সেবক কত', লিপিচ্যুতি ও সমাক্ষরলোপের উদাহরণ।

৯২. 'সেবক'? 'ক' অক্ষরটি মনে হয় মুছে গিয়েছে।

মহাবির ইছাই ছিল তব বরে।
নাম স্বনি বিধাতা বরুন কাপে ডরে ॥
সদাই তোসার মনে ইছাইর সোক।
তব পদসেবনে পাইল পরলোক ॥
এত স্বনি সম্বরনি বিসম চিকুর।
চলিলা কৈলাস গিরি রাখিয়া ঢেঁকুর ॥
[১৭][৯৩] ইছাইর অস্তি থুইল্য জান্নবির জলে।
সপিণ্ডন ঐমুনি সাধিল তার কুলে ॥
কৈলাস সিখরে গিয়া দিল দরসন।
দ্বিজ রূপরাম গান সখা নিরঞ্জন ॥১১॥

জয় জয় ঢেকুর আনন্দ ত্রিভুবন।[৯৪]
বারমতি পুর্ন্ন হইল্য বলে দেবগনে ॥
সভা ভাঙ্গি জতেক দেবতা গেল ঘর।
জোড়া সিংহা সারে কালু ঢেঁকুর ভিতর ॥
তরুতলায় বসিল ময়নার তপোধন।
হেন কালে সম ঘোস করে সম্ভাসন ॥
লাউসেনে ভেট দিল নানা দ্রিব্যজাত।
সমুখে ঐমনি রহে বুকে দিয়া হাত ॥
পান হাতে দিয়া রাজা করিল আস্বাস।
বসিতে আসন দিল সঙ্গে ছিল দাস ॥
লাউসেন বলে স্বন সম ঘোষ রায়।
গৌউড় সহর চল রাজার সভায় ॥
কদাচিত পুত্রসোক না করিহ মনে।
বড় স্বুখ পাইল রাজা তোমার বচনে ॥
অনাদের পদরেনু ভরসা কৈল।
দ্বিজ রূপরাম গান ধর্ম্মের মঙ্গল ॥

এত দুরে ইছায়ের পালা সমাপ্ত ॥ জথাদিষ্টং তথা লিখিতং লিখিয়োকো দোসক নাস্তি ॥ সন ১০৩৯ সাল তাং ১ পোষ সক্ষাক্ষর শ্রীপরুসরাম ঘোষ এ পুস্তক পঠন করিতে দিলাঙ শ্রীনিমু কলুকে দক্ষিনা টং ৵০ দুই আনা দিবে

৯৩. পুথির এই পৃষ্ঠার আলোকচিত্র আলাদাভাবে ছাপা হলো।
৯৪. 'ত্রিভুবনে'?

নির্ঘণ্ট

দিব্য-মানুষ গীত ৩৬

শাকে নিমে পূর্ণ কৈলে যত শক হয়।
পঞ্চকলা পঞ্চ রস পঞ্চ বেদ রয়॥
রন্ধ্র পাশে রন্ধ্র দেহ ধন্দ নাহি আর।
সেই শকে গ্রন্থ এই হৈল সুসার॥